পঞ্চম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান

ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবীর' রচনার বৈচিত্রতায় নারীজীবনের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার নিরিখে মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি নিপুণভাবে সাহিত্যের প্রতিটি পর্বে ব্যক্ত করেছেন। আর তাতে করেই উঠে এসেছে মানব-মানবীর বাস্তবিক জীবনের সম্পর্ক। বহুরকম প্রেক্ষাপটে চিরায়ত ভঙ্গীতেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগের মাধ্যমে, স্পষ্টতর করে তুলেছেন মানবিকতার সংজ্ঞা। তিনি পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করে স্বীকার করেছেন 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, জীবনের নানাবিধ কর্মে ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে'। এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশী গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বেশী উপন্যাস রচনাতেই তিনি সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতিকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলতে পেরেছেন। আর তাই উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর নারী কেন্দ্রিক সমস্ত গবেষণার নির্যাসকে প্রতি-রূপায়িত করেছেন। তিনি বাঙালী জীবনের অন্তঃপুরকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, ঠিক সেভাবে আর কেউ পেরেছেন কিনা; খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেবলমাত্র পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজে নারীর দুর্গতির কথাই শুধু তিনি লেখেননি, নারী মননের উদার-প্রাঞ্জলতা, অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা সমস্তকিছুকে সমানভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি লেখার প্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপট। বেশীরভাগ উপন্যাসে তিনি উক্ত

সময়সীমার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেই সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থানগত তথ্যকেই কাহিনী ও জীবনরসে জারিত করে উপস্থাপিত করেছেন। নারী জীবনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে 'আশাপূর্ণা দেবী'র রচনা প্রসঙ্গে বলা যায়–

''মজ্জায় মিশে যাওয়া বহুকালের সংস্কারের অভ্যাস! পুরুষ পূজিত, নারী পূজক। পুরুষ ভোক্তা, নারী ভোগ্য এবং ভোগের আয়োজক। পুরুষ নিয়ামক, নারী নিয়মের আজ্ঞাবাহক। নারী-পুরুষের জৈব বিভেদকে অধিকার বিভাজনের ভিত্তিতে রেখে তৈরি হয়েছিল পিতৃতন্ত্রের কৌশলী বিন্যাস। একদিকে পুরুষ নিজের দম্ভের মূর্তিকে ক্রমশ স্ফীতকায় করেছে, অন্যদিকে নারীর অজ্ঞতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা প্রমাণের হাজারো আছিলায় তাকে কঠিন মুঠিতে অধিগত করেছে। সুরক্ষা দেওয়ার নামে তার চারপাশে গড়েছে অবরোধ। নারীর মনের জমিন পতিত থেকেছে। তাতে আবাদ করলে সোনা ফলত কিনা, তা পরখ করার সুযোগ কোথায়? বর্ষণের সুযোগ নিয়ে কর্ষণে মেতেছে পুরুষ। ফসল পেয়েচে তারাই। তবে বঞ্চিতের সহিষ্ণুতায় একদিন তো টান পড়েই''।[১]

'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাস লেখার কালপর্ব প্রায় গোটা বিংশ শতাব্দী। আর এই শতকেই বাঙালী সমাজ-সংস্কৃতিতে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। এইসময় নারীদের জীবন কেন্দ্রিক নানারকম কুসংস্কারের মোড়ক ভেঙে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিধবা হলেই সতী হতে হবে, লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যাবে, এরকমের বহুরকম প্রতিবন্ধকতা থেকে নারীদের শৃঙ্খল মুক্তি ঘটে এই পর্বে। আমরা জানি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে সাহিত্যিকরা ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বাস্তব তথ্যসূত্র অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেন। এই সৃষ্টির জগতে 'আশাপূর্ণা দেবী'ও ব্যতিক্রমী নন। তিনি তাঁর সমকাল ও পূর্ববর্তীকালের সমাজ পরিবেশকে যথাসাধ্য ভাবে চিত্রিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই সকল কর্মে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদারের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ক্রমে নারীকে বন্ধনে জড়াতে জড়াতে পুরুষ তার গৃহ নামক কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। 'শিবনাথ শাস্ত্রী' মহাশয় 'গৃহধর্ম' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন–

''নারীর জন্যই গৃহ জনপদের সৃষ্টি। গৃহ মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান তাহার। পুরুষ গৃহের রক্ষক ও গৃহকর্মে মন্ত্রী; কদাচ গৃহের রাজা নহেন। অবরোধ প্রথা– পারিবারিক সুখ ও পারিবারিক সমূহের পবিত্রতা উভয়ের শত্রু। উন্নত সমাজে পুরুষ ও নারী মুক্ত ভাবে অথচ সংযত ও পবিত্র ভাবে পরস্পরের সহিত মিশেন। নারীর ধৈর্য, লজ্জা, প্রেম। নারীর জন্য নিরুদ্বেগ ও শান্তিময় স্থান প্রয়োজন। নারীর স্নেহ দয়া কেবল পরিবার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষে বিবাহই সাধারণ নিয়ম;[২]

আমরা তাই সাধারণ ভাবে একটি কথা বলতে পারি। একেবারে প্রাক-প্রাথমিক বর্বরতার যুগে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে খাদ্যান্বেষনের জন্য একবৃক্ষ থেকে আর একবৃক্ষে বন্যপ্রাণের সঙ্গে সমান তালে সংগ্রাম করতো। তারপর ধীরে ধীরে গুহার অন্বেষণ ও তারমধ্যে জীবনযাপনে স্বাভাবিকভাবে শারীরিক কারণে ও গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য নারীদের প্রয়োজন হল আবরণ ও আগল। আর তাকে সমস্তরকম বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেন পুরুষ। প্রাণের রক্ষা করার তাগিদেই একদিন নারী হয়ে উঠলো শক্তির আধার, আর পুরুষ হয়ে গেল শক্তির ধারক ও পূজারী। পুরুষের পেশীশক্তির জোড়ের কারণে নারী নিজেকে ক্রমে নিরাপদ মনে করে পুরুষের বাহুবন্ধনে। জীবনযাপনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করে নিজেই বেছে নিলেন গুহার অন্ধকার। অবশ্য সেখানে থেকেও পুরুষের সহমর্মী ও সহকর্মী হয়ে নারীরা সঙ্গ দিতেন। আর তার ফলেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অনবরত ক্রমান্বেষণের মধ্য দিয়ে সংযোজিত হয়েছে নতুন থেকে নতুনতর ধারা। নারীরাই প্রথম জীবনের

প্রয়োজনে খিদের তাগিদে সৃষ্টি করে কৃষির প্রক্রিয়া। তাদেরই জানা ছিল ফসল ফলানোর বীজমন্ত্র। কিন্তু যখন ফসলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক স্থাপিত হল সেই মুহূর্ত থেকে পুরুষ সমস্ত কৃষি প্রক্রিয়াকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। একইভাবে সমস্তরকম সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র-শিল্প প্রক্রিয়ার মূল উদ্ভাবক নারীরা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের পায়ের নিচের জমি ছেড়ে দিয়ে পুরুষের পিছনে থেকেছে।

বাংলাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে আমরা প্রথম 'চর্যাগীতিতে' দেখি নারী চরিত্ররা নানাভাবে জীবিকা উপার্জন করতেন। সেখানে 'ডোমনীদের' কথা আছে, তাঁরা তাত বিক্রি করে, বিক্রির জন্য চাঙারি তৈরি করে। কখনো কখনো তাঁরা উদরের স্বার্থে গণিকাবৃত্তির কাজও করতেন। 'বড়ু চণ্ডীদাসের' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও নারীর জীবিকা প্রসঙ্গ আছে। 'রাধা' রোজ পসরা নিয়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে করে হাটে দহি দুগ্ধ বিক্রি করতে যায়। আবার তার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে 'বড়ায়ি'কে। সেসব কাব্যে রক্ষক ও পরিচায়িকা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'মনসাবিজয়ে' 'হাসান হুসেনের' সাতবাঁদী ও 'সনকার' সাহসী দাসীর কথাও উল্লেখ করা যায়। ঐ একই কাব্যে আমরা 'পুষ্প, দুগ্ধ ও দহি' বিক্রেতা যুবতী নারীর উল্লেখ পাই। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেখি আধুনিকা নারীর প্রতিচ্ছবি। 'ফুল্লরা' সমস্ত রকম গৃহকর্ম সম্পন্ন করার পরেও হাটে গিয়ে মাংস বিক্রি করে। ঐ কাব্যের আর এক চরিত্র 'খুল্লনা' সতিনের চক্রান্তে ছাগল চড়িয়ে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়। 'ভারতচন্দ্রের' 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও 'ঈশ্বরী পাটনী'কে যদি আমরা নারী হিসেবে ধরে থাকি, তাহলে আর একজন জীবিকা সন্ধানী নারীর সন্ধান আমরা মঙ্গলকাব্যে পেয়ে থাকবো। যে নারী নৌকা পারাপার করে শুধুমাত্র নিজের সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। 'ভারতচন্দ্র' সৃষ্ট অন্যতম চরিত্র 'হীরা

মালিনী' নায়ক-নায়িকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে আরকান রাজসভার কবি 'দৌলত কাজী' রচিত 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যেও নারীর বিভিন্ন চারিত্রিক রূপের বিবর্তন চোখে পড়ার মতো।

কালেক্রমে বাংলাসাহিত্য মধ্যযুগের সময় পেরিয়ে প্রজাপতির মতো গুটি কেটে গদ্যসাহিত্য প্রকাশ হতে থাকলে, নানারকম সামাজিক অবস্থার বর্ণনার মধ্য দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আর গদ্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের জন্ম সেকথা বিস্তারিত আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে না। সূচনা মুহূর্তের 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে আজকেরদিন পর্যন্ত যার ধারা প্রবহমান। মধ্যযুগের কাব্যে নারীকে যেভাবে প্রকাশ করা হত তার থেকে পরিবর্তিত রূপে নারীর বিচিত্র রূপ অঙ্কনে ঔপন্যাসিকরা প্রথম থেকে সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন আঙ্গিকে বিবর্তনের ধারাপথে নারীর জীবন বিশ্লেষিত হয়েছে কখনো পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কলমে, আবার কখনো নারীর হাতে নারীর কথা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। প্রথম দিকের উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ইতিহাস স্থান লাভ করেছে বেশী করে, তুলনায় সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব পরবর্তীকালে। স্বাভাবিক ভাবে ইতিহাসের ধারাপথে নারীর পদচিহ্ন খুব দ্রুত বিলীন হয়ে গেছে। তাই প্রথম দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে নারীর প্রাধান্য কম। এই প্রসঙ্গে 'ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের' মত হল–

''ক্রমপরিণতির দিক দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণ শক্তি উপন্যাস ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনায় অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিতেছিলাম। উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিক সংখ্যায়

রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই''।[৩]

সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে মানবজীবন ও সেই সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়াদি প্রকাশের মাত্রা লাভ করে। অবশ্য একবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া যায় উপন্যাসের নিজেরই একটা মানবতাবাদী রূপ আছে। কারণ উপন্যাসের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র চালিত হয় লৌকিক নিয়মে, সেখানে অদৃষ্ট অথবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মতো দেব-দেবীর তেমন কোন হস্তক্ষেপ ঘটে না। শুধুমাত্র দেব-দেবীর প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, কোনরকম অলৌকিকতাকে উপন্যাসে স্থান দেওয়া যায় না। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র বাস্তব জগতের মানুষ, চারপাশে দৃশ্যমান অত্যন্ত চেনা মানুষ। তাই তাদের বিশ্লেষণ করতেও স্বাভাবিক ভাবে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার। শুধুমাত্র উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই সমালোচকের কাজ নয়, তার সঙ্গে জীবন বোধ ও জীবনদর্শন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের কি মন্তব্য তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন একজন প্রকৃত সমালোচক। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে কিভাবে মানব জীবনের বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়, তারই অন্বেষণে সাধারণত পাঠকের সজাগ দৃষ্টি থাকে। পাশাপাশি ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসার কথাও পাঠকের লক্ষ রাখা দরকার। ঔপন্যাসিকের জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে সমালোচক 'সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখেছেন –

''জীবনের সামগ্রিক বোধ এবং Pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘন সন্নিবদ্ধ একটি উপন্যাস থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটাই সন্ধান করি। উপন্যাসের Pattern মানে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই অখণ্ড রসমূর্তি রচনা, যা পাঠকের রস-পিপাসার সর্বতোভাবে নিবৃত্তিসাধক– সেই Pattern লেখকের এই জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হল লেখকের জীবনদর্শন''।[৪]

'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাস পাঠকেরা প্রায় সকলেই মেনে

নিয়েছেন যে, লেখিকা সারাজীবন ধরে যা কিছু নিজের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করেছেন তাই উপন্যাসের পরতে পরতে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তিনি তেমন ভাবে বিদেশী সাহিত্য বা উপন্যাসের তত্ত্বকে পাঠ করে লেখার জগতে আসেননি। নিজস্ব কর্মোদ্দমে জীবনের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে হেলায় তুচ্ছ করে জীবনের রূপদানে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সমকালীন সমাজকে নানাভাবে প্রতি-রূপায়িত করে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর তার জন্যই হয়তো আমরা 'সত্যবতী'র মত মাটির কাছাকাছি থাকা বাস্তব চরিত্রকে তাঁর উপন্যাসে খুঁজে পাই। আসলে 'আশাপূর্ণা দেবী' সাহিত্যের পাতায় যে সমাজের প্রতিচ্ছবি রচনা করেছেন, তা সমাজের যে কোন প্রান্তে খুঁজে বের করতে বেশী সময়ের দরকার হয় না। কেননা, তিনি যেমন রান্না ঘরের ভিতর থেকে পরিবারের সমস্তরকম খুঁটিনাটি সচেতন দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনি বাইরের পৃথিবীকেও একই ভাবে বাড়িতে বসেই উপলব্ধি করেছেন। আর তাই স্বাভাবিক ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন মহিলার লেখাকে সহজেই পুরুষ সমালোচকরা 'মেয়েলি লেখা' বলে কটুক্তি করেন। কিন্তু সমস্ত বাঁধাকে হেলায় তিরস্কার করে 'আশাপূর্ণা দেবী' তাঁর লেখায় অব্যক্ত নারীর বেদনাকেই রূপদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে পদার্পণ করেন। তাঁর লেখার বিষয় খুব সহজেই হয়ে দাঁড়ায় সমাজের নারী চরিত্রের বিচিত্র অবস্থান। আর সময়ের প্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। মেয়েরা সমাজের অর্ধাংশ, তাঁদের কথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখিকা 'আশাপূর্ণা দেবী'। পূর্ববর্তী নারী-ঔপন্যাসিকদের তুলনায় উপন্যাস রচনায় সংখ্যার দিক থেকে যেমন বেশী, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র ও জীবন পর্যালোচনার সমস্ত ব্যাপারে তিনি অগ্রবর্তিনী। তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য বিষয় মধ্যবিত্ত ঘরের চেনা-জানা চির

পরিচিত মানুষ। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যার মূল কেন্দ্রে রয়েছেন মেয়েরা। মরমী কথাকার 'আশাপূর্ণা দেবী' মেয়েদের অধিকারহীনতা, আশা-আকাঙ্খা, অতৃপ্তি, সুখ-দুঃখের, বেদনার, ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর রচিত উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা কালে সর্বাগ্রে 'ট্রিলজী'র কথাই মনে আসে। তাঁর বিখ্যাত 'ট্রিলজীর' তিন নায়িকা রক্তের সম্পর্কে মা, মেয়ে ও নাতনি। প্রথমজন 'সত্যবতী', অন্যজন 'সুবর্ণলতা' আর শেষেরজন 'বকুল'। তিনজন চরিত্র বিখ্যাত তিনটি উপন্যাসের নায়িকা। তবে একথাও বলতে হয় 'আশাপূর্ণা দেবী' রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলিও জনপ্রিয় ও সাহিত্যের দরবারে সমাদর পেয়েছে। 'প্রেম ও প্রয়োজন' যদিও তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস তবুও জনপ্রিয়তার খামতি থাকেনি। পরবর্তীকালের 'অগ্নিপরীক্ষা', 'উন্মোচন', 'উত্তরণ', 'জহুরি', ইত্যাদি উপন্যাসের কথাও একইভাবে বলা চলে। প্রতিটি উপন্যাসে আলাদা ভাবে একদিকে যেমন নূতন দিগন্ত সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চির-অবদমিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, পীড়িত মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। আসলে 'আশাপূর্ণা দেবীর' রচিত উপন্যাসগুলির সময়ের প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে শুরু করে বর্তমানকালের প্রারম্ভিকপর্ব পর্যন্ত। যখন গোটা বাংলাদেশে গৌরীদানের পূর্ণ লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন সমাজপতিরা। বিভিন্নরকম কুসংস্কারের মধ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষ জর্জরিত ছিল। সেইসময় নারীশিক্ষা নিয়ে মিশনারীদের সামান্য উদ্যোগ চলছে শহরের বুকে। আর গ্রাম বাংলার নারীসমাজ সেসময় লেখা-পড়া তো দূরের কথা, নিজেদের সামান্যতম চাহিদাও মুখ ফুটে উচ্চারণ করার সাহস পেত না। 'আশাপূর্ণা দেবী' সেই

মেয়েদের জীবন চিত্রিত করেছেন যারা কোনদিন বুঝতে পারেনি সব কিছু থাকতেও কেন তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই।

'আশাপূর্ণা দেবী'র প্রথম উপন্যাসের নাম 'প্রেম ও প্রয়োজন'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখিকার স্বতন্ত্র মানসিকতা স্পষ্টতর হয়ে যায়। সমসাময়িক সমাজকে উপন্যাসে প্রকাশ করার রীতি সূচনালগ্ন থেকেই চলে এসেছে। 'আশাপূর্ণা দেবী'ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে বেশীরভাগ উপন্যাসে প্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের আনুমানিক চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটের কাহিনী। কয়েকটি মধ্যবিত্ত (আর্থিক দিক দিয়ে) পরিবারের কথা তুলে ধরে কাহিনীর বয়ান তৈরি করা হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে একদল ছেলের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে, পূর্বজ ঔপন্যাসিকদের প্রচলন করা প্রথাকে কিছুটা আমল দিয়ে পুরুষের পরিচয়ে নারী চরিত্রের অবতরণ। নারীকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিতির জগতে নিয়ে আসার দক্ষতা লেখিকা প্রথম উপন্যাসে দেখাতে পারেননি। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় 'প্রবীর', 'অমরেশ', 'কালো গৌরাঙ্গ', 'সমর', 'বিজয় মল্লিক' সবাই একটি পাড়ায় বসবাস করে। তাদের পারিবারিক বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের একটি করে কাহিনীর সূত্রপাত। আবার একটি কাহিনীর সঙ্গে আর একটি কাহিনীর যোগের মধ্য দিয়ে নতুন একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর অবতরণা। আর এই পুরুষ চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নারী চরিত্রগুলি উপন্যাসের কাহিনীর মোড়কের মাঝেই উঠে আসে। 'প্রবীরের' মা 'জ্যোতির্ময়ী দেবী' এবং তার পালিতা কন্যা 'মন্দিরা', 'অমরেশের' বিধবা পিসি 'কৃষ্ণবালা', বৌদি 'আরতি' প্রমুখ নারী চরিত্র। নারীর সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে 'আশাপূর্ণা দেবী' পূর্বজ ঔপন্যাসিকদের থেকে কিছুটা ঋণ নিয়েও স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখতে পেরেছেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে

প্রথম লেখা উপন্যাসেই স্পষ্ট করে সেকথা বলা সম্ভব ছিল না। তিনি নারীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার অবকাশ দিয়েছেন চারিত্রিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করতে নারী চরিত্রগুলির সার্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে। উপন্যাসটিতে 'আরতি' নামে নারী চরিত্রটির দাম্পত্য সম্পর্কের কথাই শুধু বেশী করে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য বাকি চরিত্রগুলির প্রাক-দাম্পত্য ও অন্ত-দাম্পত্যের পর্যায়ের কথা কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'আরতির' স্বামী 'অখিলেশ' একসময় অফিসের চাকরি করে সংসারের ঘানি টানতো। একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি সাধক। কিন্ত হঠাৎ 'অখিলেশের' সংসারের প্রতি মায়া কমে যায় একজন সাধুর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে উদাসীন জীবন যাপন করতে থাকে। সাধনায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সাধুবাবার চরণে উৎসর্গ করে দেয়। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে 'আরতি' অথৈ জলে পড়ে। অর্থাভাব আর অনাহারের কবলে পরে হঠাৎ কলেরা রোগে সন্তানটি মারা যায়। 'আরতি' কোনমতেই স্বামী 'অখিলেশ'কে তার সন্তান হারানোর জন্য ক্ষমা করতে পারে না। নিজেকে মুক্ত করতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সাহায্য চায় পাশের বাড়ির যুবক 'প্রবীরের' কাছে। 'প্রবীর' মানসিক দিক দিয়ে বহুদিন আগে থেকে প্রস্তুত ছিল এই নরক যন্ত্রনা থেকে 'আরতি'কে মুক্ত করার জন্য। তাই স্বাভাবিক ভাবে সে এই ঘিঞ্জি গলির চাপান-উতর থেকে তাকে মুক্তির সন্ধানে নিয়ে যায়। যেদিন 'আরতি' দীর্ঘদিনের মায়া বন্ধন ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ করে চলে যায়, অপমান বোধে 'অখিলেশ' আত্মহত্যা করে। খুব স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় যে 'অখিলেশ' সন্ন্যাসী হয়নি। সংসারে বৃত্তের বাইরে তার নজর ছিল না। শুধুমাত্র ভণ্ড ধার্মিক হয়ে সে উদাসীন জীবন যাপন করতে ভালোবাসত। আর সে তার

স্ত্রীকে রেখেছিলো গৃহবন্দী করে। যেদিন তার পুরুষত্বের গায়ে আঘাত লেগেছে, নপুংসকতার পরিচয় দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 'আরতি' আর 'প্রবীর' নতুন করে জীবন শুরু করার জন্যই, পুরাতন সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে গেছে। যখন তারা জীবনের প্রয়োজনেই নিজেদের অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে, তখন 'প্রবীরের' মুখে একেবারে বাস্তব সংলাপ দিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলেন লেখিকা। প্রবীরের সংলাপ –''...আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা করব না এ শুধু একদিনের দয়ামায়া নয়, যখন তোমার সঙ্গে না ছিল পরিচয়, না ছিল চোখের দেখা, তখন থেকে প্রতিনিয়ত তোমার বঞ্চিত জীবনের গ্লানি আমাকে পীড়া দিয়েছে, তোমার ক্ষোভের বেদনা অহরহ করেছে আকর্ষণ। অমরেশ যখন পালালো তখন কি ইচ্ছে হয়েছিল জান আরতি? ইচ্ছে হয়েছিল–সেই নিষ্ঠুর দৈত্যপুরীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে। নিজের মনকে সবসময় বিশ্বাস করতে পারতাম না বলেই এড়িয়ে যেতাম তোমার সঙ্গ। আজ দৈব ও দুর্দৈব যাই বল দুজনকে সংসারের গণ্ডির বাইরে এত কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই হয়তো এত বড় অসম্ভব কথা শোনানোর দুঃসাহস হল। তাই বলছি – তোমার সব ভার বইবার সৌভাগ্য আমাকে দাও আরতি''[৫]। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে একজন নারী ঔপন্যাসিক কী কঠিন দুঃসাহসে এরকম একটি সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যেখানে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' কলম নামিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকেই নতুন করে 'আশাপূর্ণা দেবী' শুরু করেন। তিনি কত স্বাভাবিক ভাবে একজন বিধবা নারীর নতুন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। যে অধিকার পূর্বে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর সৃষ্ট অন্যতম নারীচরিত্র 'বিনোদিনী' অথবা 'দামিনী'কে দিতে পারেননি। ঠিক যেমন দিতে পারেননি 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' তাঁর সৃষ্ট 'রমা' আর 'অচলা'কে। 'আশাপূর্ণা দেবী' প্রথম উপন্যাসের মধ্যে এতদিনের জমাট বাঁধা অথচ বহুআলোচিত বিধবা নারীর নব-দাম্পত্য জীবনকে স্পষ্ট করে উল্লেখ

করেন। আর তাই তিনি উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চরিত্র হিসেবে ‘প্রবীর’কে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করতে চান, একজন বিধবার সঙ্গে কঠিন সমাজ-বাস্তবতায় দাম্পত্য জীবন শুরু করার পর কোন অনুশোচনা বা অবৈধ-প্রেমের অজুহাত তাকে টলাতে পারেনি। আসলে ‘আরতি’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীত্বের নিষ্ঠুর অবমাননার বিরুদ্ধে ‘প্রবীরের’ মাধ্যমে ঔপন্যাসিক একটি জোরালো সামাজিক প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নারী আপন ভাগ্য আপনি জয় করতে পারবে তার পরিবেশ তখনও তৈরি হয়নি। তাই পুরুষের সহযোগিতায় নারীত্বের অপমানের, বঞ্চনার জবাব দিতে পুরুষকেই দাঁড় করান রঙ্গমঞ্চে। অবশ্য পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক আর তেমনভাবে পুরুষের সহযোগিতা না নিয়েই ‘সত্যবতী’, ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলের’ মতো নারীচরিত্র তৈরি করেছেন যারা নিজেরাই পারে নিজের ভাগ্যকে জয় করতে।

আলোচ্য উপন্যাসে ‘আরতির’ যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন তাতে করে নারীত্বের অবমাননার কথাই বার বার উঠে এসেছে। কিন্তু শতগঞ্জনা ও অপমানের পরেও যে নারী সংসারের সুখের জন্য মুখ বুঝে থাকে, তাকেই একসময় জয়ী করিয়েছেন ঔপন্যাসিক বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর মধ্য দিয়ে। আর সেই প্রেক্ষাপটে জীবনের সমস্ত গ্লানি ও পিছুটান মুছে দিয়ে ‘আরতির’ মতো নারী বেছে নেয় জীবনের সঠিক রাস্তা। সে যেমন করে ‘প্রবীরের’ সঙ্গে নতুন করে দাম্পত্য জীবন শুরু করে, তাতে করে একজন নারীর যথাযথ সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়। এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সার্থকতা।

‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীত্বের

প্রসঙ্গ অথবা নারীর সামাজিক অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে 'অরুণ কুমার বসুর' একটি মন্তব্য তুলে ধরা দরকার। তিনি 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' তৃতীয় খণ্ডের' ভূমিকায় লিখেছেন–

''প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসে তিনি বাঙালী হিন্দু পরিবারের অনেক নীচতা ও সংকীর্ণতা পরশ্রীকাতরতা অনুদারতার বিবরণ দিয়েছেন, ভঙ্গি অন্যরকম হলেও যা শরৎচন্দ্রকে অবশ্যই স্মরণে আনে। ...কিন্তু যা উপন্যাস পাঠের পরম প্রাপ্তি তা 'আশাপূর্ণা দেবীর' অমিতসাহসিকা বিদ্রোহিনী সত্তা। আরতিকে নিয়ে প্রবীরের সংসার স্থাপনের যে উদাহরণ এখানে তিনি পেশ করেছেন, তা শিকলভাঙা প্রেমের জয়গান নয়, তা তাঁর নারীমুক্তি চেতনার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত''[৬]।

নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'আশাপূর্ণা দেবীর' ভূমিকা প্রনোধানযোগ্য। প্রথম উপন্যাসে এরকম দৃঢ় পদক্ষেপ ভাবিকালের পাঠকের কাছে নতুন যুগের দুয়ার খুলে দিতে পারে।

আমাদের সমাজে নারীদের যেভাবে পণ্যবস্তু হিসেবে গণনা করা হয় তার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। ''অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তির পরেই সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে উত্তরাধিকার সৃষ্টির বিষয়টি মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের মাঝে এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এল। নিজের গর্ভের সন্তানের (মূলত পুত্র সন্তান) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার ফলেই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে মানুষ। আগে যে পুরুষের পালিত জীব জন্তু এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীর সংখ্যা যত বেশী ছিল সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও ছিল তত বেশী''[৭]। উদ্ধৃত উক্তি থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গৃহপালিত পশু মানুষের অর্থনৈতিক দিকে প্রতিষ্ঠা দিতো। কালক্রমে

গৃহপালিত পশুর সঙ্গে নারীকেও গণনা করা শুরু হতে থাকে, এবং নারী হয়ে ওঠে পুরুষ পরিচালিত সমাজের পণ্য সামগ্রী। যে দলে অথবা দলপতির কাছে নারীর সংখ্যা বেশী থাকবে তিনি তত বেশী বিত্তবান বলে মনোনিত হয়ে আসতেন। তাছাড়া আর একটি বিষয় নারীর সংকটের অন্যতম কারণ, প্রাচীনকাল থেকে যত বড় যুদ্ধ হয়েছে তার পেছনে মূল কারণ ছিল অশ্ব, উট, হাতি প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সঙ্গে নারী লুন্ঠনের বিষয়। নারীর কোন জাত থাকতো না, প্রাচীনকালে জলের মতো নারী যে পুরুষের কাছে থাকতো তার পরিচয়ে পরিচিত হত। এই ধারা যে আজ প্রবহমান তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ জন্মের পর নারী পিতার পরিচয়ে পরিচিত, বংশানুক্রমে পিতার উপাধি(Surname) নারীকে গ্রহণ করতে হয়, বিবাহের পরে স্বামীর উপাধিতে পরিচিত হতে হয়। একালের বিখ্যাত নারীবাদী সমালোচক 'সুতপা ভট্টাচার্য' এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –

"প্রাচীন ভারতে নারীকে যে মানুষ বলে গণ্য করে নি, তা আরও স্পষ্ট হয় তার সমাজ বিন্যাস লক্ষ্য করলে। চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজে নারীর কোন বর্ণ? নারী যে ব্রাহ্মণ হতে পারে না, ব্রাহ্মণের কন্যা বা জায়া হলেও—এতো সকলের জানা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের ঘরে জন্মে নারী কি ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের অধিকার লাভ করে? পিতা বা স্বামীর পরিচয় অনুসারে নারী পরিচয় পায়, তার নিজের কোন পরিচয় নেই, কোন বৃত্তি নেই। প্রাচীন ভারতের নারী তাই পুরুষের হাতের যন্ত্র, খেলার পুতুল, ভোগের উপকরণ"[৮]।

এইসমস্ত কারণে হয়তো নারী ঔপন্যাসিকরা প্রথম থেকেই বহুদিনের এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্ত এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য প্রতিটি ছত্রে যেন প্রশ্ন করেছেন, নারী কবে মানুষ হবে? যেমন করে 'জ্যোতির্ময়ী দেবী' তাঁর 'ছায়াপথ' উপন্যাসের নায়িকা 'সুপ্রিয়ার' মধ্য দিয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে। যার কোন উত্তর কারো জানা নেই। সুপ্রিয়ার প্রশ্নগুলি

যেন প্রতিবাদের দৃঢ় ভাষা। ‘পুরুষেরা নারীকে নিয়ে ঘর করে, কিন্তু শ্রদ্ধা কোথায়? সম্মান কোনখানে? সম্ভ্রম কই’? আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যেন কোনরকম উত্তর দিতে পারি না।

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ প্রতিটি উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। প্রথম উপন্যাসে যেভাবে নারী চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন তারই ধারা বজায় থেকেছে পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সমস্ত উপন্যাসের আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির দাম্পত্য জীবনের নিরিখে সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য একটি কথা স্বীকার করে নিয়ে বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সমাজের প্রচলিত বহুমানব চরিত্রকে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতো করে অন্যকোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও গার্হস্থজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেননি। একান্নবর্তী পরিবারের কথা তাঁর অনেক উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নিজের জীবনে যা দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তাই তাঁর রচিত উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। আর তাই একান্নবর্তী পরিবারের চিত্ররূপ তার জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হিসেবে ‘মিত্তির বাড়ি’ উপন্যাসটির নাম করা যেতে পারে। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেই ঔপন্যাসিক বিষয় ও চরিত্রের পরিচয় দিয়ে পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাঠককে শুধু উদ্ধার করতে হয় কিভাবে লেখিকা বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন, কারণ পরিবেশনই হল সৃষ্টিকর্তার নির্মাণের ভিত্তি।

মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসের শুরুতেই যে নারী চরিত্রটি চোখে পড়ে তার নাম 'উমাশশী'। বহুদিন আগেই সে দাম্পত্য সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিয়ে বাবার বাড়িতে এসে বটবৃক্ষের মতো শিকড় তাড়িয়ে বসেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তার কাছে সে একজন সেবিকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছেন–'উমাশশী তাঁহার নিজের মেয়ে বলিয়ায় শুধু নয়, বিধবা মেয়ে বেওয়ারিস মাল, তাই প্রথম পর্বে তাকেই তলব দেওয়া সহজ'। একজন পিতা তার মেয়েকে কাজের জন্য কিভাবে ডাকবেন সেই প্রসঙ্গে লেখিকার উদ্ধৃতি উল্লেখ করার মতো। তবে চরিত্রটির সম্পর্কে খুব অল্প কথায় বলা যায় যে 'সমস্ত দিকের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে নেহাত ঠেকায় পড়ে পিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার নিরিখে বহুদূরে উড়ে যাবার ক্ষমতা থাকলেও, কুসংস্কারের শিকলে নারীদের পা বাঁধা থাকতো পরিবারের গণ্ডিতে। তাই নিজের মতো করে জীবন যাপনের সাহস জুগিয়ে উঠতে পারেনি 'উমাশশীর' মতো শত-সহস্র বাঙালী বাল্য বিধবা নারীরা। তাই 'উমাশশী'ও ক্রমশ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে মিত্তির বাড়ির একান্নবর্তী সংসারের সঙ্গে।

আলোচ্য উপন্যাসে চল্লিশের দশকের কোলকাতার এক জীর্ণ পুরাতন বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের কথা বলা হয়েছে। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা তেত্রিশ জন, একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করেই দিন কাটায়। বাইরের জগতের স্রোত এদের হৃদয় স্পর্শ করে না, সর্বদাই শুধু চলে পরনিন্দা পরচর্চা আর কলহ। কেউ কারো উন্নতি দেখলেই ঈর্ষার বশে ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে। একই ছাঁদের তলায় বাস করলেও পরিবারের সবাই একে অপরের শত্রু। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস সমালোচক 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'

লিখেছেন –

‘‘মিত্তির বাড়ি’ বহু পরিজন সমবায়ে গঠিত একটি যৌথ পরিবারের চিত্র। গৃহকর্ত্রী হেমলতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ জা-এরা, অনেকগুলি ভ্রাতা ও তাঁহাদের স্ত্রী সন্তান কয়েকজন পিতৃ গৃহাশ্রিতা বিধবা কন্যা ও এক সদ্য বিবাহিতা তরুণ পুত্রবধু– এইগুলি মিলিয়া এক বৃহৎ জটিল শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত সংসার। বাহিরের এই শিথিল ঐক্য ঈর্ষা-দ্বেষ-কলহ-তীক্ষ্ণ বাক্য বিনিময় ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার অভিঘাতে সর্বদা বিড়ম্বিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র নর-নারী ব্যক্তিত্ব চিহ্নাঙ্কিত বাকি সকলে একান্নবর্তী পরিবারের আসবাব-পত্রের সামিল। উহাদের ভিড়ে পদে পদে হোঁচট লাগে, স্বচ্ছন্দ বিচরণ করার স্হান সংকুচিত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত-সংঘাতে বাঁকা-চোরা হইয়া উঠে। এক সংসারকে জানিলেই সব সংসারকে জানা হয়; উহাদের বহির্বিন্যাস একটু-আধটু ভিন্ন; অন্তঃপ্রকৃতি হুবহু এক। কখনও কখনও বাহিরের আগন্তুক আসিয়া পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও তীব্র ও জটিল করিয়া তোলে। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের যে রূপ দেখা দেয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিকৃত। এমন কি উদার, আদর্শবাদী মনও এই গ্লানিময় পরিবেশে বৃথা সংগ্রামে আত্মক্ষয় করে ও সহজ, প্রসন্ন স্বার্থকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক চিত্তদাহকারী দাবানলে সমস্ত সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ঝলসাইয়া ফেলে’’[৯]।

এরকম পরিবারের কথা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ বহুউপন্যাসে লক্ষ করা যায়। একান্নবর্তী পরিবারগুলির মধ্যে নারীর পারিবারিক অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা কতটা আছে, তা নির্ধারণ করার জন্য ঔপন্যাসিকের অনেক গবেষণার নির্যাস হল এক একটি উপন্যাস। নারীরা অবগুণ্ঠনের তলায় থেকেও কিভাবে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজের অর্ধেক আকাশ অধিকার করে, তার ধারাভাষ্য যেন আমরা পাঠ করতে পারি তাঁর উপন্যাসে। তিনি ‘মিত্তির বাড়ি’ উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন, তারা যেন তাঁরই অঙ্গুলী নির্দেশে কখনো

প্রতিবাদ করেছে আবার কখনো নিয়মের বন্ধনে থেকেও স্বপ্ন দেখেছে দূর আকাশে উড়ে যাওয়ার। মিত্তির বাড়ির নারীদের মধ্যে অনেকেই গৃহবধু, দু'একজন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ ভুলে বৈধব্য জীবন যাপন করছে। আলোচ্য উপন্যাসে দুজন নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ দুজনই যুগের নিরিখে প্রতীকধর্মী চরিত্র। একজন গৃহকর্ত্রী 'হেমলতা' আর অন্যজন তারই নাতবৌ 'সুরেখা'। দুজনের মধ্যে একটা কালের ব্যবধান। একজন সংকীর্ণমনা, অন্যজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বময়ী। প্রথমজন কারণে অকারণে নিজের ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে ক্রোধে সবাইকে ভস্মীভূত করতে চায়, আর দ্বিতীয়জন সেবায় শুশ্রূষায় ক্ষমা সুন্দর ব্যবহারে সমস্ত কিছুকে নিষ্কলঙ্ক করে তুলতে চায়। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ 'সুরেখা' হল আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা, 'আশাপূর্ণা দেবীর' সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতমা। আমরা খুব সহজে 'সত্যবতী', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল'দের সঙ্গে 'সুরেখার' নাম উচ্চারণ করতে পারি। 'সুরেখা' মিত্তির বাড়ির সকল সদস্যদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। সকলকে মেনে নিয়ে সংস্কার করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে আছে। কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত' এর মতো অবস্থা হয়েছে 'সুরেখার'। কেউ তাঁকে বুঝে সঙ্গ দেয়নি, উল্টে প্রতিবাদ করেছে তার আধুনিকতার বিরুদ্ধে। 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের' ভূমিকায় 'নিতাই বসু' আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"সুরেখা আধুনিক মনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মেয়ে। তার নিজস্ব বিচারবোধ আছে, কিন্তু তার স্বামী মনোজ ওই বাড়ির ছাঁচে গড়া ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। সুরেখা অবশ্য ওদের সংসারে মানিয়ে নিতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু সে ওদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেনি। মানুষ যে কত নির্মম কঠিন রূঢ় ও সংকীর্ণ হতে পারে, তা মিত্তির বাড়ির বউ হয়ে না গেলে সুরেখা কখনও বুঝতে পারত না। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেককে আঘাত করার জন্য সর্বদা উদ্যত। ওরা মনুষ্যত্বের কোন মূল্য দেয় না। অসহিষ্ণু অসন্তুষ্ট কতকগুলো জীব যেন দৈবক্রমে

জট পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। সত্যিকারের কোন বন্ধন নেই, সবাই যেন নিরাশ্রিত। মর্যাদাবোধ নেই, আছে নিছক আস্ফালন; ক্ষমা নেই, আছে শুধু বিচার করার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া; করুণা নেই, আছে শুধু নির্মম শাসনের প্রয়াস''[১০]।

'সুরেখার' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমালোচক 'নিতাই বসু' চারপাশের বৃত্তে থাকা অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তবে দাম্পত্য সম্পর্কের বৃত্তে থেকে সবচেয়ে বেশী প্রস্ফুটিত চরিত্র হল 'সুরেখা'। যে মিত্তির বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের অন্তঃপুরের প্রচলিত নিয়ম রীতি ভেঙে, আধুনিক মানসিকতায় সামাজিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। গৃহকর্তী 'হেমলতার' দুর্দান্ত শাসনের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখতে পেরেছে। সে যেন সরল রেখার মতো ঋজু মনোভাব নিয়েই এই সংসারের সিংহদুয়ারে পা রেখেছিল। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল 'হেমলতার' দাপট; তবু কোন ভয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ না থেকে লড়াই করেছে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য। 'আশাপূর্ণা দেবী' গৃহকর্তী 'হেমলতার' দাপটের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন –''বাহিরের লোক লৌকিকতা আচার ব্যবহারেই হোক, অথবা সংসারের আয় ব্যয় অনুসারে বিহার ব্যসন বিলাসের হিসাব কষাতেই হোক, তাঁহার উপর কাহারও কথা কহিবার হুকুম নাই''[১১]। এইরকম প্রতিকুল অবস্থাতেও 'সুরেখা' ব্যক্তিগত নারী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। আর যার ফলে জগদ্দল পাথরের মতো আঁকড়ে থাকা মিত্তির বাড়ির কুসংস্কারের ভিত নড়ে যায়। যেখানে মিত্তির বাড়ির কোন নারীর বাইরের আলো দেখা নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে 'সুরেখা' জ্ঞানেরআলোয় সমস্তরকম নিষিদ্ধতা দূর করে দেয়। সে নিজেই স্বামীর সঙ্গে পার্কে লেকচার শুনতে গিয়ে প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে মেয়েদের মেলামেশার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তার এই কাজে গৃহকর্তী অপমানিত বোধ করে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়। বাড়ির সকলে 'সুরেখা'কে ক্ষমা চেয়ে নিতে বললেও, সে তাতে রাজি হয়নি। সে

নিজের জেদে ও সংস্কারের জোড়ে অটল ছিল। আমরা যেন এখানে 'সুবর্ণলতার' সঙ্গে 'সুরেখার' মিল খুঁজে পাই। 'সুবর্ণলতা' যেমন অন্যায়কারী শাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চায়নি; সুরেখাও তেমনি বিনাঅপরাধে পিসিশাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চায়নি। 'সুরেখা' বুঝতে পেরেছিল মাথানত করে নয়, অপমানের বোঝা বহন করে নয়, যথাযোগ্য অধিকার নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বাস করতে হবে। আর তাই প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে সে বলে–''তোমাদের মিত্তির বাড়ির মান অপমানের মানদণ্ড এতো সুক্ষ্ম যে নিশ্বাস ফেলতেও ভয় করে, হিসাব কষে ফেলতে হয়। কি জানি পাল্লা নেমে গেল বুঝি। ...সেদিন মেজকাকার সামনে খবরের কাগজ পড়ে ফেলেছিলাম, শুনলাম সেটা তার পক্ষে অপমান। ...মাথা ধরেছে বলে মায়েদের কিছু আগে শুতে এসেছিলাম, শুনলাম সেও নাকি গুরুজনের পক্ষে অপমান। ...বারোমাসে এ মান-অপমানের ট্যাক্স যোগানো কি সত্যি সম্ভব''[১২]। সম্ভব যে কোনদিনই ছিলনা তা সকলেই জানতো, কিন্তু কেউ কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেনি। আর তাই 'সুরেখা'কে দেখে অন্যান্য নারী চরিত্ররাও একটু একটু করে পরিবর্তন হতে থাকে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে মিত্তির বাড়ির সকলেই মানবিক মর্যাদার কথা মেনে নিয়েছে। আলোর দিশা দেখানোর জন্য 'সুরেখা' সকলের অগ্রজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবে 'সুরেখা' চরিত্রটিকে আমরা সহজেই ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি। ব্যক্তিত্বময়ী স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য তার স্বামী মনোজ ও মিত্তির বাড়ির পরিবারের সকল সদস্যকে একইসঙ্গে সংস্কারের বন্ধনে জড়াতে পেরেছে। তাই সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে আলোচ্য চরিত্রটি আলাদা করে সম্মানের দাবীদার বলে মনে করা যেতে পারে।

'আশাপূর্ণা দেবী' নারীচরিত্রের বিভিন্নরূপ অঙ্কন করেছেন

বহুউপন্যাসে ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে। প্রতিনিধি স্থানীয় নারী চরিত্রগুলিকে আমরা দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে পারি। 'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসের 'সুরেখা' চরিত্রটিকে বধু রূপে আমরা দেখতে পাই। একজন গৃহবধু তার দাম্পত্য জীবনে কিভাবে স্বামী ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সামলে নেয়, সেকথা আমরা 'সুরেখা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। কিন্তু একজন নারীকে গৃহবধু হিসেবে কোন গৃহে আসার আগে, পিতৃগৃহে কন্যারূপে লালিত-পালিত হতে দেখা যায়। তাই 'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাসে যেসমস্ত নারীচরিত্র কন্যারূপে বালিকা বয়সেই স্বামী ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়, তাদের কথাই বেশী করে আলোচনা করা যেতে পারে। 'আশাপূর্ণা দেবীর' যেসমস্ত উপন্যাসে বালিকাবধু বা কন্যা চরিত্রগুলি দেখা যায়, তার একটা তালিকা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

উপন্যাসের নাম	**উপন্যাসে বালিকাবধুর নাম**
'অগ্নিপরীক্ষা'	তাপসী চরিত্র।
'প্রথম প্রতিশ্রুতি'	সত্যবতী ও সুবর্ণলতা চরিত্র।
'সুবর্ণলতা'	সুবর্ণ ও বকুল চরিত্র।
'বকুলকথা'	নমিতা, রেখা ও শম্পা চরিত্র।
'শশীবাবুর সংসার'	সুমিত্রা চরিত্র।
'নেপথ্য নায়িকা'	মাধবী চরিত্র।
'দিনান্তের রঙ'	নীতা চরিত্র।
'নিলয় নিবাস'	লুসি চরিত্র।
'তনুশ্রীর জন্য'	তনুশ্রী চরিত্র।
'লীলা চিরন্তন'	মৌমিতা চরিত্র।

উপন্যাসের নাম	উপন্যাসে বালিকাবধুর নাম
‘মিত্তির বাড়ি’	সুরেখা চরিত্র।
‘তুলির টানে আঁকা’	তুলি চরিত্র।
‘দ্বিতীয় বসন্ত’	লতিকা চরিত্র।
পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি	কনক চরিত্র।
‘নীলপর্দা’	রীণা চরিত্র।
‘অবগুণ্ঠিতা’	শেফালি, সুনন্দা ও উদিতা চরিত্র।
‘নিমিত্ত মাত্র’	সর্বাণী ও সুরভি চরিত্র।
‘ছোট সে তরী’	চারুলতা ও বাবলি চরিত্র।

‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক ‘অরুণ কুমার বসু’ লিখেছেন–“শরৎচন্দ্রের পারিবারিক কাহিনীর উত্তরাধিকার বহন করেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রতিষ্ঠা আদায় করে নিয়েছিলেন, একথা সত্যি। তাই ভুল বুঝাবুঝি, সত্য গোপনের কানামাছি খেলা; তাই নিয়ে সৃষ্ট চরিত্রের মনে টেনশন ঘনিয়ে তোলা, আর সমাপ্তির কাছে এসে মধুর আবেগমোক্ষণ –এই জাতীয় গল্পের সাধারণ লক্ষণ। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ জনপ্রিয় চিত্রমুখী এই প্লট রহস্যটি আয়ত্ত করেছিলেন, যা তাঁর বহু উপন্যাস পাঠ জনিত মেধারই পরিচায়ক। অগ্নিপরীক্ষা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ”[(১৩)]। ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসের কিছু নারীচরিত্রের বাল্যকালেই বিবাহ হয়ে বৈধব্যবরণ করতে হয়েছে, এদের মধ্যে ‘মাধবী’, ‘রমা’, ‘শুভদা’, ‘সাবিত্রী’, ‘হেমনলিনী’, ‘সুরমার’ মতো নারীচরিত্রের নাম করা যেতে পারে। আবার এমন কিছু চরিত্র আছে যারা বাল্যবিবাহ করার পরেও দাম্পত্য জীবনের কোথাও কোন খামতি আসেনি। আসলে নারীর জীবন বহুরূপে

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আসছে উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিকলগ্ন থেকে। কারণ নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে সমস্ত লেখকদের সমবেদনার অভাব কোন কালেই দেখা যায়নি। 'শরৎচন্দ্রের' সময়েও সমাজ ও সমাজপতিদের অনুশাসনে নারীরা বিভিন্ন দিকে কোণঠাসা হয়ে থাকত। আর তাই হয়ত যাঁদের চোখের জলের হিসেব কেউ রাখলো না, তাঁদের কথা বলতে গিয়ে 'শরৎচন্দ্র' কলম তুলে নিয়ে ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি তাই উপন্যাসের পরিণতিতে হয় সমাজপতিদের বিধান মেনে নেয়, অথবা আত্মত্যাগ করে জীবনযাপন করে। বেশীরভাগ নারীকে তার প্রেমের বলিদান দিতে হয়েছে 'শরৎ সাহিত্যের' আনুকূল্যে। শরৎ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গে 'আশাপূর্ণা দেবী' নিজে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ''শরৎচন্দ্র একটা আলাদা জগতের চেহারা পেয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের মনোজগতের ছবি দেখেছিলেন। সেখানে তিনি ঘরোয়া মেয়েদের মধ্যেও যে শক্তি, দৃঢ়তা, বিদ্রোহ লক্ষ করেচিলেন, রবীন্দ্রনাথের চোখেও তখন তা এতটা ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা যেন 'দূর আকাশের তারা'। শরৎচন্দ্র ঘরোয়া জীবনকে সামনে এনে ধরে দিয়েছিলেন। সেখানে নারীর সেবা যত্ন আছে, উদ্বেগ ব্যাকুলতাও আছে কিন্তু তার সঙ্গে তার দৃঢ় মানসিকতার ছবিও আছে। সব শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই শরৎচন্দ্র মানসিকতার বিকাশ দেখেছেন, এবং সেটি জানিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্রর নায়িকারা পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়নি, তার থেকে মহত্তর হতে চেয়েছে। তারা সামান্য হয়েও অসামান্যা''।[১৪] 'আশাপূর্ণা দেবী' 'শরৎচন্দ্রের' এই মনোভাব থেকে কিছুটা হলেও সরে এসে প্রেমের জয় ঘোষণা করতে কোথাও কোনরকম কৃপণতা তেমনভাবে করেননি। 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসে 'তাপসী' চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক যেভাবে তুলে ধরেছেন; তাতে করে মানবিকতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাক্রম সেদিনের পরিচিত গল্পের গণ্ডির মধ্যেই সীমায়িত ছিল। 'তাপসীর' বাল্যবিবাহ ও তাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘনঘটা ধীরে ধীরে

উপন্যাসের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ তার বিবাহ হয় পিতা-মাতার অনুপস্থিতি ও অনুমতি ছাড়াই। তাই মায়ের শাসনে 'তাপসী' বাধ্য হয় পুতুলখেলার মতো বিবাহকে কিছুদিনের জন্য ভুলে যেতে। সে শহরের মধ্যে জীবনযাপনে কোথায় যেন একটা খামতি অনুভব করে। আধুনিক কালের মা 'চিত্রলেখা দেবী' তার মেয়েকে সবদিক থেকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে চান, কিন্তু বাধ সাধে 'তাপসী' নিজে। তার হাল ফ্যাশানের কাপড়-চোপোড়, অথবা সাজ-সজ্জা কোনটাই পছন্দের নয়। তার পছন্দ পুরনো দিনের ডিজাইন করা শাড়ি, আর হালকা সাজ-সজ্জা। যতদিন যায় এবং যতভাবে 'চিত্রলেখা দেবী' মেয়েকে সেই পুতুলখেলার মতো বিবাহকে ভুলিয়ে দিতে চান, ততই যেন 'তাপসী' বেশী করে গুরুত্ব অনুভব করতে থাকে জীবনের প্রথম অগ্নিসাক্ষী সাত পাকে বাঁধার ঘটনাকে। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে মায়ের সঙ্গে তার বিরোধ চরম আকার লাভ করে আলোচ্য বিষয় নিয়ে। 'কিরীটি' নামে এক সুদর্শন যুবককে যখন 'চিত্রলেখা দেবী' মেয়ের পাত্র হিসেবে মনোনীত করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার ভাবনা ছিল কিছুদিন একসঙ্গে থাকলে মেয়ের মন এমনিতেই গলে যাবে। কিন্তু 'তাপসী' যে অন্য ধাতুতে গড়া তা অনুমান করতে পারেনি তার মা। তাই 'কিরীটি বাবু'কে দূরেই রেখে 'এঙ্গেজমেন্ট'-এর দিন কাউকে না জানিয়ে কাশীবাসিনী ঠাকুমার কাছে পালিয়ে যায়। সেখানে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আগুনে পুড়ে সোনার মতো শুদ্ধরূপ পাওয়ার মাধ্যমে তাপসী শুদ্ধতা লাভ করে জীবনের যাত্রায়। অবশ্য উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে তার মনে সযত্নে লালিত ছোটবেলার সেই বিয়ের সফলতা দেখানো হয়েছে। সে জীবনের সংস্কারকে মেনে নিয়ে, অগ্নিপরীক্ষায় সফল হয়ে অগ্নিসাক্ষী স্বামীকে যেভাবে লাভ করেছে, তাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের 'তাপসী' যেন শরৎচন্দ্রের অন্যতম উপন্যাস 'দেনাপাওনা' ও 'দত্তা' উপন্যাসের নায়িকাদ্বয়ের মিলিত

রূপ। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পরবর্তীকালে লেখা ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের শম্পা চরিত্রটিকে ‘তাপসীর’ দ্বিতীয়সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। ‘বকুলকথা’র ‘শম্পা’কে আমরা দেখতে পাই ‘তাপসীর’ মতো করে। সেও তার মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের প্রিয় মানুষটিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে। কোন মা কোনদিন সন্তানকে সংসারের মধ্যে অথই জলে ফেলে দেয় না, অথবা সন্তান খারাপ হোক তা চায় না। তাই ‘বকুলকথায়’ যে মা চরিত্রকে আমরা পাই, তাকে দেখি সংস্কার ও দায়িত্বের জোড়ে মেয়েকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ‘শম্পা’কে দেখা যায় নিজের মন ও মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে গণ্ডিছাড়া জীবনযাপন করতে। মা-বাবার পছন্দকে মেনে না নিয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আলোচ্য চরিত্রটিকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ‘তাপসীর’ মায়ের মতো ‘শম্পার’ মাও চেয়েছিল কোন মর্যাদাসম্পন্ন অথবা তাদের থেকে কোন উচ্চবিত্ত ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন। যাতে করে সবদিক সঠিকভাবে বজায় থাকে, তারসঙ্গে যেন তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাতে মেয়ের মতামত আছে কিনা, অথবা পাত্রের প্রকৃত গুণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘শম্পা’কে ভালো করে অনুধাবন করার জন্য তাঁর পূর্বে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একটু ভালভাবে পর্যালোচনা করা দরকার বলে মনে করি। ‘বকুল’, ‘পারুল’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘সত্যবতীর’ মতো ‘শম্পার’ পূর্বজরা যেপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন আধুনিককালের রথ চলার জন্য; সেই পথকেই স্পর্ধায় দৃঢ়তায় ও সাহসে রাজপাথে পরিণত করার দায়িত্ব নিয়েছে ‘শম্পার’ মতো নারীরা।

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের রচনার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ‘সত্যবতীর’কাল হিসেবে ধরা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের

সময়কালকে। ‘সত্যবতী’‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের নায়িকা। উপন্যাসটিতে যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘সত্যবতী’কে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে করে বাঙালী নারীর জীবনের একটি বিশেষ সময়কে জানা যায়। একটি বিশেষ সময়ের বাঙালী সমাজের সামাজিক প্রতিচ্ছবি ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিকতার জাঁতাকলে পৃষ্ট হতে হতে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নারীর উঠে দাঁড়ানোর কাহিনী ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস। ‘সত্যবতী’ সেইসমস্ত নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছে, যাঁরা মার খেয়ে পড়ে পড়ে মরতে রাজি ছিল না, প্রতিবাদ করে নিজের ব্যক্তিত্ব তথা নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। দাম্পত্য জীবনের নিরিখে ‘সত্যবতীর’ জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এক ভিন্নমাত্রার সত্যের সন্ধান দেওয়াই ছিল ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। মাত্র নয়বছর বয়সে শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে আসে ‘সত্যবতী’। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় পিতৃগৃহে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠেছে; শ্বশুরবাড়িতে এসে সেই পরিবেশ পায়নি। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তার স্বামী ‘নবকুমার’ তার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তবুও কোনদিনই সে তার স্বামীর প্রতি বিরূপ ব্যবহার দেখায়নি। তার হৃদয়ে স্বামীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা চিরকালই ছিল। সে কোনদিন স্বামীর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেনি। স্বামীকে সহযোগিতা করেছে সবসময়, প্রয়োজনে বুঝিয়ে দিয়েছে জীবনের প্রকৃত সত্যকে। ‘নবকুমার’ নিজের স্ত্রীর দৃঢ়তা ও স্পর্ধাকে স্বীকার করে নিয়েই ভালোবাসতে পেরেছে; একথা স্বীকার করে নিতে হয়। তাই তার দাম্পত্য জীবনের কোথাও কোন খামতি দেখা যায়নি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করতে পারেনি। একমাত্র কন্যাকে কম বয়সে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়, ঘটনাক্রমে ‘সত্যবতী’কে তা জানানো হয়নি। কারণ সে চেয়েছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখবে এবং সবদিক দিয়ে উপযুক্ত হলে তবেই বিবাহ

দিবে। তাই তার কন্যা জন্মের পরেই স্বামীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছিল, মেয়ে উপযুক্ত হলে তবেই বিবাহ দেবে। তাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে কোনরকম তোয়াক্কা না করে সে চিরদিনের মতো কাশিবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার নিজের সুখের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে।

'সত্যবতী' তার স্বামী 'নবকুমার'কে বহুক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে, কিন্তু শেষবার যখন তার স্বপ্ন ভেঙে গেছে তখন আর সে মেনে নেয়নি। শুধু বলেছে –'সুবর্ণ যদি মানুষ হওয়ার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, সে মানুষ হলে নিজের জোরেই হবে! তার মাকে বুঝবে'। শুধুমাত্র নিজের সন্তানের কথা চিন্তা করে 'সত্যবতী' ঘর ছাড়েনি, সেকালের ও পরবর্তীকালের হাজার হাজার 'সুবর্ণর' কথা ভেবে প্রতিবাদ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল 'সুবর্ণরা' জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সার্থকতা খুঁজে নিয়ে, একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক। নিজের দাম্পত্য জীবনের যে শিখা 'সত্যবতী' স্বযত্নে লালিত করেছে, সামাজিক মর্যাদার লড়াই করতে গিয়ে সেই শিখার ধ্রুমকুণ্ডলী তৈরি করে দিয়ে যবনিকা টেনেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবে 'সত্যবতী' একটি প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে দাম্পত্য জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গ্রামের গলিপথ থেকে কোলকাতার রাজপথে স্বামীকে নিয়ে আসে। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের দাম্পত্য জীবনকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে। মর্যাদায় আর সম্মানে নিজের সঙ্গে স্বামীকে জড়িয়ে এগিয়ে চলতে চায় বহুদূরের পথ। সেই দাম্পত্য জীবনের সর্বনাশ করে 'নবকুমার' ও তার মা 'এলোকেশী দেবী'। কোনওরকম পরামর্শ ছাড়াই একমাত্র কন্যা 'সুবর্ণলতার' কিশোরী অবস্থাতেই বিবাহ দিয়ে দেয়। যা 'সত্যবতী' কোনভাবেই মেনে নেয়নি, চরম অপমানবোধে সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপনে। সেই অপমান শুধু তার একার নয়, সেকালের

প্রগতিকামী সকল নারীর, সেকথা সে নিজেও জানতো। কারণ সে সারা জীবন এমন বহু নারীকে দেখেছে, যাঁরা বিবাহ ও দাম্পত্য নামক যুপকাষ্ঠে নিজেদের ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে আমরা অনেকরকম দাম্পত্য সম্পর্কের সন্ধান পাই। সত্যবতীর পিতা-মাতা 'রামকালী চাটুয্যে' ও 'ভুবনেশ্বরী দেবীর' দাম্পত্য জীবন তার মধ্যে ভিন্নধর্মী। গোটা উপন্যাস জুড়ে দেখা যায় নির্ভেজাল দাম্পত্য সম্পর্কে কোনদিন কোনরকম বিবাদ ঘটেনি। কারণ হিসেবে বলা যায় 'ভুবনেশ্বরী দেবী' স্বামীর সমস্তরকম কাজকর্মে কোনরকম সংশয় না রেখে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে বহুবিবাহের যুগেও একপত্নী ও একটি কন্যাসন্তান নিয়ে সুখী ছিলেন 'রামকালী', বংশরক্ষার অজুহাতে দ্বিতীয়বিবাহ করেননি। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কাজ-কর্মে 'ভুবনেশ্বরী দেবীকে' কোথাও কোনরকম প্রশ্ন করার মতো কারোর অবকাশ ছিল না। তার মাথার ওপর ছিলেন শাশুড়িমা 'দীনতারিনী', পিসিশাশুড়ি 'কাশীশ্বরী' ও 'মোক্ষদা'। তাই কোন কাজে কোনরকম মত প্রকাশ করা; কিংবা বিশেষ কোনকাজে কারো অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা তার আয়ত্তে ছিল না। এককথায় তিনি স্বামীঅন্ত প্রাণ, তাই স্বাভাবিক ভাবে বিরোধ তো ছিল না, কোন মতান্তরের অবকাশও ছিল না। একসময় দেখা যায় তার মেয়ে 'সত্যবতী' লিখতে পড়তে শিখেছে এই নিয়ে গোটা পরিবারের মহিলামহলে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। কি হবে 'সত্যবতীর', ঘোরতর পাপ করেছে সে, কি করে শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে যাবে? এরকম নানান প্রশ্নে যখন সবাই বাড়ির পরিবেশ অস্থির করে তুলেছে; ঠিক তখন নীরব থেকে 'ভুবনেশ্বরী' সমস্ত প্রশ্নের যেন উত্তর দিয়ে দেন। আমরা জানি নীরবতা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির লক্ষ্মণ। এরপরও সকলে মিলে 'সত্যবতীর' এই ঘোরতর অপরাধের জন্য বিচার চাইতে রামকালীর কাছে দরবার করে। আবার

সকলে মিলে 'ভুবনেশ্বরী'কেই সমস্তঘটনার সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছে বিচারকের সামনে। সেকালের নিয়মের জাঁতাকলে দিনেরবেলা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেখা করা নিষেধ ছিল। আর সেখানে 'ভুবনেশ্বরী' তার নিজের মেয়ের অপরাধের কথা জানাতে যাবে স্বামীর কাছে, এই সময়ের সঠিক বর্ণনা করেছেন লেখিকা 'আশাপূর্ণা দেবী', তিনি লিখেছেন–''ভুবনেশ্বরী অবশ্য একথার কোন উত্তর দেয় না। দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে, যদিও তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তবু গুরুজনের সমক্ষে স্বামী সম্পর্কে উল্লেখই যে যারপরনাই লজ্জাজনক। ভুবনেশ্বরী যে রামকালীর সঙ্গে কথা কয়, এতবড় লজ্জার কথাটা শাশুড়ি এই লোক সমাজে প্রকাশই বা করে বসলেন কেন? ছি ছি! লজ্জা প্রতিকারের আর কিছু না দেখে মাথার ঘোমাটাটাই আর খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে ভুবনেশ্বরী''[১৫]। দায়িত্ব যখন নিয়েছেন তখন পালন তো করতেই হবে। ভয় লজ্জা সমস্ত কিছুকে জয় করে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়, লজ্জায় মাথা নত করে স্বামীকে জানিয়ে দেয় 'সত্যবতীর' লেখাপড়া শেখার কথা। 'রামকালী' সত্যতা যাচাই করার জন্য 'সত্যবতী'কে ডেকে পাঠিয়ে লিখে দেখাতে বলেন। তখন 'ভুবনেশ্বরী' ভেবেছিল কালের কঠোর নিয়মে বুঝি 'সত্যবতীর লেখাপড়া বন্ধ হবে। কিন্তু যখন জানতে পারল 'রামকালী' তার মেয়েকে পড়াশুনা করাতে চায়; তখন তার আনন্দের সীমা থাকল না। ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' আলোচ্য চরিত্রের মনন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য লিখেছেন একটিমাত্র বাক্য, 'ভুবনেশ্বরীর দু'চোখে শ্রাবণ নামে'। আর কিছু লিখতে হয়নি ঔপন্যাসিককে, একটিমাত্র বাক্যে যেন বুঝিয়ে দেন আসলে মা কি চায় নিজের সন্তানের জন্য। 'সত্যবতী' লেখাপড়া শিখবে, সমাজের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এগিয়ে যাবে বন্ধুরপথে আগামী প্রজন্মের জন্য। যেসময় সমাজের পুরুষ সমাজপতিরা মেয়েদের জীবনের চারপাশে কুসংস্কারের গণ্ডি এঁকে দিতো, সেসময়েই 'রামকালী' তার মেয়েকে পড়াশুনা করার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। এখানে অলক্ষে

যেন মা হিসেবে জয়ী হয়েছেন 'ভুবনেশ্বরী দেবী'। সুখী দাম্পত্য জীবন ছিল 'ভুবনেশ্বরী দেবীর', আর সেই সুখের কারণেই সিঁদুর মাথায় নিয়েই একদিন হঠাৎ কাউকে জানান না দিয়েই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। 'রামকালী' গোটাজীবনে যে জীবনসঙ্গীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি; মৃত্যুর পরে যেন তার অনুপস্থিতিতে বুঝতে পারে সে জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল। আসলে প্রতিটি মানুষই কাছে থাকা মানুষের মূল্য ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, যখন দূরে চলে যায় তখন তার মূল্য বোঝা যায়। ঔপন্যাসিকের কথায় রামকালীর অনুভূতি ব্যক্ত হয় –''সেই ছোট খাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোনদিনই পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেননি, সে যে দৃঢ় কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যেই ছিল না। ...ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তার একটা বাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি ছিল, জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখ-দুঃখে তাকে ডাক দেননি। আজ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচার করেননি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিনী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না''[১৬]। 'ভুবনেশ্বরীর' সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে 'রামকালীর' কোথাও খেদ নেই, আর তাই হয়তো বহুবিবাহের যুগেও রামকালী দ্বিতীয়বিবাহ করেননি। একজন গৃহিনী ও স্ত্রী হিসেবে 'ভুবনেশ্বরী' ছিলেন যথার্থ, 'রামকালীর' মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ সঙ্গী হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। তাই সমস্তদিক থেকে পর্যালোচনা করে 'ভুবনেশ্বরী দেবী'কে একজন যথার্থ নারী চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলোচ্য উপন্যাসে একটি গৌণ নারী চরিত্র দাম্পত্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে

আছে। ‘জটার বৌ’ নামে পরিচিত চরিত্রটির ভাগ্যান্বেষণের যাত্রায় নিজের প্রকৃত নামটাও হারিয়ে ফেলেছে। সামাজিক সংস্কারের বন্ধনে স্বামীর নামেই সে পরিচয় লাভ করেছে ‘জটার বৌ’ নামে। কিন্তু ‘জটা’ প্রকৃত পক্ষে তার নামের উপাধি বহনকারী স্ত্রীকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি। সে রোজরাতে মাতাল হয়ে চর-ঘুষি-লাথি দিয়ে স্ত্রীকে বাধ্য করে কথা মতো কাজ করতে। সংসারের কাজ যে ‘জটার বৌ’ করে না তা নয়, আসলে নারীর উপর নির্যাতন করা পুরুষের পুরুষত্বের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু স্বামীর লাথি খেয়েও ‘জটার বৌয়ে’র মতো নারীদের কিছু করার থাকে না। আকাশের মেঘের মতো উড়ে যাওয়ার সাধ থাকলেও, সংসারের গভীরে তাদের জীবন শিকড় পোথিত হয়ে যায় বিবাহের দিনেই। স্বামীর লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কোনরকমে বেঁচে উঠলে ‘সত্যবতী’ তাকে বলেছে –‘তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পার’? কিসের ভয় তা সন্ধান করার ক্ষমতা ‘জটার বৌয়ে’র নেই। যার নিজস্ব নাম হারিয়ে যায়, স্বামীর পরিচিতিতে পরিচিত, অন্যের হাতে যার জীবন সুতা নিয়ন্ত্রিত। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ খুব সচেতনভাবে আলোচ্য চরিত্রটিকে সহানুভূতিশীল সম্পন্ন করে তুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নামহীন, গোত্রহীন, বর্ণহীন ও উপাধিহীন নারীকে বাস্তবের সম্মুখে দাঁড় করে দিয়ে নারীর নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তোলা। কতদিন আর দাম্পত্য সম্পর্কের যুপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে থাকবে। দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করে কেন নিজের অধিকার ও জীবনের সঠিকস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে না? এরকম বহুপ্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলোচ্য চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের আর একটি নারী চরিত্র দাম্পত্য জীবনের নিরিখে আলোচনার দাবি রাখে। ‘সারদা’ নামে নারী চরিত্রটি ‘রাসবিহারীর’ প্রথমা স্ত্রী। আলোচ্য চরিত্রটি ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ হৃদয় নির্যাসে

নির্মিত। কারণ এই একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে কোমল স্নেহাতুরা আর অন্যদিকে প্রখর মুখরা এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'সারদা' চিরকাল চেয়েছে তার যেন সতিন না থাকে অথবা কোনদিনই না হয়। বিবাহের সময় সে প্রথমা স্ত্রী হিসেবেই সংসারে এসেছিল, সমাজের বহুবিবাহের সময়কালে অন্যান্য নারীদের মতো সেও সেঁজুতি ব্রত পালন করত, যেন তার সতিন না হয় সেইকারণে, তাই সে সেঁজুতি ব্রতের ছড়া মুখস্থ করে বলেছিল–

"অশ্বত্থ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি
ময়না ময়না ময়না
সতিন যেন হয় না"[১৭]।

কিন্তু যে যেটা চায় না তার কপালে যেন তাই ঘটে। তাই ঘটনাক্রমে 'সারদার' সেঁজুতি ব্রতের কোন ফল লাভ হয় না। উল্টে তার পুন্যকর্মে ছাই দিয়ে সতিন আসে ঘরে। এরপরই দেখা যায় যে 'সারদা' স্বামীর সোহাগে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল; কিছুদিনের মধ্যেই সে কেমন কঠোর হয়ে যায়। সতিন যেন না আসে সেজন্য স্বামীকে তিন সত্যির শপথ দিয়েছিল, নিজে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল। সোহাগে আদরে স্বামীকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। 'আশাপূর্ণা দেবী' সারদার স্বামী সেবা সম্পর্কে লিখেছেন –"গরমকালে রাতে পাখা ভিজিয়ে সারারাত বাতাস করে স্বামীকে, শীতের রাতে পিদ্দিমে হাত তাতিয়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাত-পা গরম করে দেয়। ...আর সংসারের কাজে রান্নাঘরের গরমে যতই গলদঘর্ম হোক, সৌখিন বরটির কাছে রাতে শুতে আসার সময় গা-হাত ধুয়ে কোঁচানো মিহি শাড়িখানা পরতে ছাড়ে না, মাথায় গন্ধ তেলটি দিয়ে একটু চকচকে হয়ে আসতে ভোলে না"[১৮]। তার সমস্তরকম আত্মাহুতি ও কঠোর পরিশ্রম ভস্মে পরিণত হয়। সতিন 'পটলীর' প্রতি প্রথমাবস্থায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সর্বনাশ করতে চাইত; কিন্তু তার মরমী মন যখন

স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন আর জোড় করে তা আদায় করতে চায়নি। তাই শেষপর্যন্ত নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 'পটলী'কে দিয়ে কাশীবাসী হয়ে যায়। এখানে 'সারদা' চরিত্রের মধ্যদিয়ে আমরা একজন নারীর জীবনে হাসি মুখে দাম্পত্যসুখ ত্যাগ করতে দেখি। নিজের সুখ ঐশ্বর্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যে বহুকষ্টে আগলে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বামীর সোহাগ বিসর্জন দিয়ে পথে নেমে যায়, আর এক বৃহৎ সংসারের খোঁজে। 'সারদা' চরিত্রটি তাই একদিকে মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে মহামানবিকতার স্তরে উন্নিত হয়েছে। যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরে সে বাঁচতে চেয়েছে, দাম্পত্য সম্পর্কের সেই বন্ধনে নোনা জল প্রবেশ করেছে 'পটলীর' বেশে। অভিমান করে তাই সে সংসার ত্যাগ করে নিজের সমস্ত সুখ দিয়ে যায় 'পটলী'কে। মহানুভবতায় আর ত্যাগে তাই 'সারদা'কে অনতম নারী চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে।

দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র 'সত্যবতী'কে অনুশীলন করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর সামাজিক অবস্থানের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'সত্যবতী' চরিত্রটিকে নতুন করে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন হল তার দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণের জন্য। প্রকৃত অনুসন্ধানে আমরা হয়তো দেখবো তার দাম্পত্য জীবনে না পাওয়ার বেদনা ও মানিয়ে নেওয়ার অভিসন্ধি। যেন সুখের আড়ালে থাকা পর্দাবেষ্টিত অভিশপ্ত জীবন। দূর থেকে সাজানো বাগানের মতো মনে হলেও, আসলে ধূ ধূ করা মরুভূমির ক্যাকটাসের মতো। তার দাম্পত্য জীবনের শুরুটা আচমকা দমকা বাতাসের মতো, যেমন কিছু বুঝে ওঠার আগেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। পিতা 'রামকালী' গৌরীদানের পুন্য অর্জনের জন্য তার বিবাহ সাতবছর বয়সেই সম্পন্ন করেছিল। অবশ্য বিবাহের পরেই কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেননি

‘রামকালী’। তার ইচ্ছে ছিল কিছুকাল বাপেরবাড়িতে থেকে ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম শিখে তারপর কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে। কিন্তু বিবাহের একবছর পূর্ণ না হতেই সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক পাঠানো হয় নববধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পত্রবাহককে পারিতোষিক দিয়ে ফেরোৎ পাঠান ‘রামকালী’, কারণ তিনি সেসময় উপলব্ধি করেন তার কন্যার এখনো পুতুলখেলার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি। কিন্তু তার ভাবনাকে বুড়োআঙ্গুল দেখিয়ে কিছুদিন পর আবার পত্র আসে ‘সত্যবতী’কে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সঙ্গে হুমকি দিয়ে বলা হয় –এবার নববধুকে না পাঠালে পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেবেন ‘নীলাম্বর বাড়ুয্যে’। ‘রামকালী’ এই স্পর্ধায় অপমানবোধ করে, এবং সিদ্ধান্ত নেয় কোনদিনই কন্যাকে সেই গৃহে পাঠাবেন না। কিন্তু সত্যবতী চায় না তার পিতার উঁচু মাথা কোন কারণে সমাজের কাছে নিচু হয়ে যাক। তাই সে নিজেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুত হয়ে পিতাকে সম্মত করে। তারপর শ্বশুরবাড়িতে এলেও সে দীর্ঘদিন স্বামীকে দেখেছে বন্ধুর মতো, যে দূর থেকে কথা বলে এবং দুঃখে-দুখী ও সুখে-সুখী হয়। সমব্যাথী হয়ে ‘নবকুমার’ তার স্ত্রীর উপর মায়ের নির্যাতনের জন্য ‘ভবতোষ মাস্টার’কে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠায়। প্রথমদিকে তাদের মধ্যে সেরকম বাক্যালাপ হয়নি, হঠাৎ একদিন ‘সত্যবতী’ অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ‘নবকুমার’কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে, ‘তার পিতাকে কে চিঠি পাঠিয়েছে’? যদিও সত্যবতী জানতো নবকুমার চিঠি পাঠিয়েছে; তবু সামনাসামনি প্রশ্ন করে তাকে লজ্জায় ফেলতে চায়। স্ত্রী সম্পর্কে ‘নবকুমারের’ সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন একটি বাক্যে যেন মাটিতে মিশে যায়। মধুর আলাপ ও সম্ভাষণের স্বপ্ন সে যেভাবে দেখেছিল, তা যেন ‘সত্যবতীর’ জেদ ও কাঠিন্যের জন্য অনায়ত্ত থেকে গেছে। প্রথমদিন থেকেই ভীত সন্ত্রস্ত ‘নবকুমার’ ধীরে ধীরে বৌয়ের প্রশ্রয়ে কিছুটা স্বাধীন মত প্রকাশ করার অবকাশ পায়। কবে কিভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়েছিল তা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ নেই

উপন্যাসের কাহিনীতে। ‘সত্যবতী’ যেভাবে মানুষ হয়েছে, তাতে করে তার মতে সংসার মানে শুধু ঘরকন্না করে দু’বেলা খেয়ে পড়ে বাঁচা নয়। নিজেকে সুখী রেখে অন্যকে সুখ দেওয়াতেই প্রকৃত আনন্দ। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচা, এবং যথার্থ সম্মানের সঙ্গে সমাজের অন্যতম একজন হয়ে জীবনযাপন করাই হল প্রকৃত সংসার ধর্ম। ‘সত্যবতী’ তার নিজের জীবনাদর্শে অটুট ছিল, কিন্তু সেসময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তা ছিল অস্বীকার যোগ্য স্পর্ধা। কারণ সে নিজে ও তার মতাদর্শ তুলনায় সেদিনের থেকে ছিল আধুনিক। সে প্রতিবাদ করেছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে। তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলে শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসে। ‘ভাবিনীর’ বোনকে শাশুড়ি ও স্বামী মিলে হত্যা করলে, সে প্রতিকার চেয়ে গোরা সাহেবকে চিঠি লিখে আবেদন জানায় হত্যাকারীর যথার্থ শাস্তির জন্য। যে মেয়ে দেশের আইনের কথা বলে, সমাজের কুসংস্কারে বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদ করে, সেই মেয়ের স্বামী হিসেবে ‘নবকুমার’ যেন অনেকটাই নিষ্প্রভ। ‘সত্যবতী’ ছোটবেলা থেকেই পিতার কাছে পেয়েছে সমস্ত রকম প্রশ্রয়, তাই মনের ভিতর একটা কর্মের চেষ্টা ও অদম্য সাহস ভিত তৈরি করে ফেলে। তুলনায় ‘নবকুমার’ কিছুটা রক্ষণশীল, ভয়প্রবণ ও স্নেহাতুর। দুজনের ধ্যান-ধারণায় ভিন্নতার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে তেমনভাবে সুখের দেখা মেলেনি। দোষারোপ করলে দুজনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। একদিকে পুরুষ হিসেবে বহুক্ষেত্রে ‘নবকুমার’ ছিল পৌরুষহীন পুংলিঙ্গ, অন্যদিকে নারী হয়েও সত্যবতীর মনে পৌরুষত্বের তেজ ও কর্মোদ্দীপনা। এরকম অহংবোধ তাকে তাড়া করতো প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে। যেসময় মেয়েরা হয় ঘরের অন্ধকারে বসে বিধবা হয়ে থাকতো, নয়তো সংসারের দাসী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিত, সেইসময় ‘সত্যবতী’ লেখাপড়া শিখে কুসংস্কারের বন্ধন মুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই মনে হয় মূর্খেররাজ্যে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পড়েছিল তার কাঁধে। অবশ্য

একটি কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, তার একগুঁয়ে জেদি অহংবোধযুক্ত মনোভাব অন্যান্য যাবতীয় গুনকে প্রায় মাটি করে দিয়েছে। আর তাই হয়তো 'নবকুমারের' মধ্য দিয়ে লেখিকা বলেন –"বাবাঃ বুড়ো হয়ে গেলাম জীবনে কখনো মন খুলে দুটো গল্প করতে পারলাম না"[১৯]। আসলে 'সত্যবতী' ও নবকুমার মনে ও মননের দিক থেকে দুজনে দুটি মেরুর বাসিন্দা। নবকুমার নিজের মতো করে বাঁচতে পারেনি, সারাজীবন অন্যের তদারকি ও মন পুষিয়ে চলতে চলতেই পথ শেষ হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' নারী জাগরণ দেখাতে চান ঠিকই, কিন্তু মানুষ 'নবকুমার'কে অস্বীকার করে নয়। আর তাই হয়তো তিনি 'নবকুমারের' পক্ষ নিয়ে বলেন –"এখন সে যেন দেখতে পাচ্ছে পুরুষ হয়েও সে পরাধীন। সত্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্যের রুচি-অরুচি সত্যের ভ্রূকুটির ভয় নবকুমারকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, কেন রে বাবা কেউ তো এমন বন্ধন দশাগ্রস্ত নয়"[২০]। কিন্তু সত্যবতী দাম্পত্য জীবনের প্রেক্ষিতে নিজেকে কেমন করে দেখেছে, সে কী স্বামীকে যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান দিতে পেরেছে? 'নবকুমার' যেভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে 'সত্যবতীর' প্রতি অনুরক্ত, 'সত্যবতী'ও কি তাই? এরকম বহুপ্রশ্নের সন্ধানে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' লিখেছেন –"সত্য তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, সে কি এই নবকুমারের বশ্যতার পরিবর্তে উল্টোটা হলে সুখী হত? অনেকবার মনের কোনে আলো ফেলে ফেলে দেখে সত্য, হত সুখী? সত্যের স্বামী যদি সত্যের যুক্তি খণ্ডন করে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিপরীত ভাবে নিজেকে চালাতে পারতো, তাতেও সুখী হত!"[২১] বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক, তিনি জানাতে চান আসলে 'নবকুমার' নিজ মতে অটল থাকলে 'সত্যবতী' সুখী ও সন্তুষ্ট কোনটাই হতে পারতো না। আর তাই হয়তো উপন্যাসের শেষে তাকে তৈরি করতে হয় অবধারিত কাহিনীর পরিণতি, যেখানে বিশ্বাসঘাতক 'নবকুমার'কে সামনে এনে 'সত্যবতীর' দোষগুলিকে আড়াল করার একটা

অবসর পাওয়া যায়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে 'সত্যবতী'কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 'নবকুমার' তার নয়বছরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দেয়। যে জন্য 'সত্যবতীর' সারা জীবনের সংগ্রাম, আর নিজের কাছের মানুষের কাছে পরাজয়ের ফলে সে হঠাৎ সিদ্ধান্তে চিরতরে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। 'নবকুমার' অবশ্য সেইমুহূর্তে 'সত্যবতী'কে প্রশ্ন করেছিল –'তোমার বাবা এত বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনিও তোমাকে সাত বছরে গৌরীদান করেছিলেন, সে কথা তো কই মনে পড়ছে না'? 'সত্যবতীর' হয়তো সারাজীবন সেকথা মনে ছিল, তাই সে চেয়েছিল তার মেয়ে লেখা পড়া শিখবে, মানুষের মতো মানুষ হবে, তারপর বিবাহ। নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার জন্যই, হয়তো বিবাহ নামক বন্ধন সম্পর্কে তার নানারকম অভিমত ছিল, বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন, কেন পুরুষের জীবনে 'বিবাহ' বহু ঘটনার একটি ঘটনা মাত্র, অথচ নারীর পক্ষে সেই বন্ধনচিহ্নটুকুর উপরেই নির্ভর করে তার ভালো থাকা-না-থাকা, তার জীবন-মরণ; একই অগ্নিসাক্ষ্যের সমস্ত দায় পুরুষ কিভাবে মোচন করতে পারে খুব সহজেই, এমনকি নিছকই খেয়াল-খুশিতেও এড়িয়ে যেতে পারে বন্ধনের সব দায়-দায়িত্ব। অথচ নারীর পক্ষে সে বন্ধন কেন চির অলঙ্ঘই থেকে যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের নিরিখে তাকে আমরা দোষ-গুণ সম্পন্ন মানবচরিত্র হিসেবে বিশ্লেষণ করে, যেটুকু নির্যাস পাই তাতে নারী জাগরণের প্রতীক হিসেবে তাকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সংসারের অন্ধকার কোণ থেকে দেখলে ধরা পড়বে কিছু দোষ-ত্রুটি। 'সত্যবতী' নিজেকে তার স্বামীর সঙ্গে কোন ক্ষেত্রেই মিলিয়ে চলতে পারেনি। 'নবকুমার' তাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিল কিন্তু নাগাল পায়নি কোনদিনই। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ছিল বিস্তর ফাড়াক। দিনের পর দিন একছাঁদের তলায় থেকেও কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। আসলে দুজনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই একে-অপরের কাছে প্রকাশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু নিয়তির পরিহাসে প্রকাশ করতে না পারার

চাপা কান্না যেন ভিতর ভিতর চরিত্রদুটিকে অন্তসারশূন্য করে তুলেছে। আসলে ‘সত্যবতী’ দাম্পত্য জীবনের মাঝপর্বে এসে যখন দেখছে স্বামীর প্রতারণা। তখন সে বুঝতে চেষ্টা করেছে মেয়েমানুষের বিয়েটাই জীবনের সর্বস্ব নয়। আর তাই মেনে নিয়ে সকলকে বোঝাতে চেয়েছে, প্রয়োজনে বিয়ের বন্ধন নামক দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ সেইযুগের প্রক্ষাপটে একজন নারী হিসেবেও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রমান পাই দুইযুগ পরের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘পারুলের’ বক্তব্যের মাধ্যমে এই ধরনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের আটত্রিশ সংখ্যক অধ্যায়ে ‘পারুল’ একটি চিঠি লেখে ‘বকুলের’ কাছে। তাতে সে জানায়–“তুই তো জানিস আমাদের মাতামহী সত্যবতী দেবীর কথা! তিনি নাকি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংসারের গণ্ডি ছেড়েছিলেন, ‘বিয়ে’ জিনিসটা ভাঙবার নয় কেন? তিনি কী এখন কোনখানে বসে তাঁর প্রশ্নের অনুকূল উত্তর পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠেছেন? দেখছেন ওটা ‘ভাঙবার কিনা’ এই প্রশ্নটাই আজ হাস্যকর হয়ে উঠেছে”[২২]। যদিও ‘পারুল’ উক্ত মন্তব্যটি করেছে তার ছেলের বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাপ্রসঙ্গে। যে বিষয়টি ‘সত্যবতীর’ সময়কালে ভাবনার অবকাশ ছিল, তাই ‘বকুল’ ‘পারুলদের’ সময়ে সহজেই বাস্তব জীবনে ঘটতে দেখা গেছে। তবুও আমরা স্বীকার করে নিতে পারি ‘সত্যবতী’ ব্যতিক্রমী সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা যেভাবে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অবহেলা প্রকাশ করেন, ‘আশাপূর্ণা দেবী’ যেন তারই প্রতিবাদ করে ‘সত্যবতী’ চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে তুলেছেন। তিনি আলোচ্য চরিত্রের বিশ্লেষণে লিখেছেন– “যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে–আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলছি–ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশী তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয়, আর

ছেলেরা পরম মানিক, এইরকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করতো। কিন্তু আমাদের আমলে তো সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমনকি গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ দুঃখ জ্বালাটা জমতো। আমাদের সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমুর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র 'সত্যবতী''[২৩]। আলোচ্য বিষয়ে ঔপন্যাসিকের দেওয়া স্বীকৃতির পরে মনে হয় তেমনভাবে আর কোনো সংলাপের প্রয়োজন হয় না। আর তাই আমরা সহজেই বলতে পারি, ব্যতিক্রমী ভাবনায়, ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপটে, ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে 'সত্যবতী' কালজয়ী হয়ে চিরকালের সামাজিকতায় উচ্চস্থানে অবস্থান করবে।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে 'সুবর্ণ' একমাত্র নারীসত্তার প্রতিনিধি। আর তাই হয়তো ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' উপন্যাসের শুরুতেই সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি লিখেছেন –''আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনী, কিন্তু সেইটুকু এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষকালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রনার প্রতীক''[২৪]। উপন্যাসের শুরু থেকেই তার দাম্পত্য জীবনের বিবরণ দেখা যায়; তবে তা মোটেও সুখকর নয়। তার ঠাকুরমা ও বাবার নির্মম খেয়ালে নয় বছর বয়স থেকেই নারীত্বের অবমাননা দেখে আসছে। তার শাশুড়ি 'মুক্তকেশী'র নানা রকম অত্যাচার ও কুসংস্কারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে একসময় বিদ্রোহী হয়ে যায়। স্বামী-সংসার সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করতে গিয়ে একসময় সে হাপিয়ে পড়ে। তবু যেন বার বার পূর্বজদের অনুপ্রেরণায় সে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়। তখন তার যুক্তি তেজের সামনে কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। কিন্তু তারপরেও যখন পরিবারের সকলে

মিলে তাকে অপমানিত করতে থাকে, তখন সেই অপমান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে তার বিবেক মনুষত্ব ও মায়ের দেওয়া শিক্ষা; যা বার বার ফিরে এসেছে সেই দিন-রাত্রির গ্লানির জীবনে। একসময় সে তার এই অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্য নির্জনে সাহিত্যচর্চা শুরু করে। তারপর মামাতো ভাসুর 'জগন্নাথ' প্রেস খুলেছে শুনে বাড়ির সকলকে লুকিয়ে বই ছাপাতে দিয়েছিল। কিন্তু সস্তা কাগজ ও ভাঙা টাইপে প্রকাশিত হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল থেকে যায়। আর তাই নিয়ে বাড়ির সকলের মধ্যে ঠাট্টা তামাশায় পরিণত হয়। কথায় আছে পৃথিবীর সকলের সঙ্গে যেকোন বিষয় নিয়ে লড়াই করা চলে, কিন্তু আপনজনেরাই প্রতিপক্ষ হলে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়াটাই শ্রেয়। 'সুবর্ণলতা' তাই সমস্ত প্রকাশিত পুস্তক আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এখানেই তার সমস্ত জীবনের আপোষহীন সংগ্রামের যবনিকাপাত ঘটেছে। আর তাই আমাদের সহজেই মনে হতে পারে, 'সত্যবতী' যেখানে নারীসত্তার বিকাশের ধারা কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে গেছে সেখানে 'সুবর্ণলতা' হয়তো অনেকটাই পিছিয়ে নিয়ে এসেছে। যদিও এক কদম এগিয়ে গিয়ে দু'কদম পিছিয়ে আসাকেও চলমান ইতিহাসের সত্য হিসেবে ধরা হয়। সমালোচক 'তপোধীর ভট্টাচার্য' আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি সুমনোনীত মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন–

''নারীর নিজস্ব সংবেদনা দিয়ে নারীর একান্ত আপন কথা লিখতে গিয়ে আশাপূর্ণা মূলত নৈঃশব্দের ঝরোখা সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ঝরোখার আড়ালে যুগের পর যুগ ধরে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে প্রকৃত নারীসত্তা। এই নৈঃশব্দ নির্মান করেছে পিতৃতন্ত্র; নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিমা হয়ে ওঠার নিশ্ছিদ্র আয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের স্বেচ্ছাবৃত পুতুল হওয়াতে নারীত্বের অবিচল প্রতিষ্ঠা –ধর্মতন্ত্র নিরলসভাবে এই আদর্শ প্রচার করে গেছে। পুরুষের ভাষা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যে-ছাঁচে তৈরি করেছে, তাকে

সংগ্রহে ও প্রবল উন্মাদনায় মান্যতা দেয় যারা তাদের আদর্শ নারী বলে বন্দনা করেছে রক্ষণশীল পৌরসমাজ। সত্যবতীর প্রতিবাদ ছিল অচলায়তনের এই সর্বগ্রাসী বৌদ্ধিক ও আস্তিত্বিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। অন্তেবাসী নারীর মানুষ হয়ে ওঠার সেই প্রথম প্রতিশ্রুতি কিন্তু, সরলীকৃত পাটিগণিতের নিয়মে রক্ষিত হয় না। কোন-এক সুবর্ণলতা প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মননে জাগিয়ে রেখেও ঈপ্সিত আগ্ন্যাধ্যান করতে পারে না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির চাপে। তবু, ...পাঠক লক্ষ করেন : 'সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন– যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায়– এগিয়ে দেয় প্রবহমান কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমানের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য জুতার মালা। ...তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে–এদের নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ...সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারী চরিত্র''[২৫]। সুবর্ণলতার' মতো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের পরে নারী প্রসঙ্গে নারীবাদী সমালোচক 'মাধবী মাইতির' একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

''নারীকে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ করে পুরুষ ও নারী উভয়ই। নির্মাণের উদ্দেশ্য কাজে লাগানো। সমাজ-সংসার ব্যক্তি সকলের কাজে লাগানো। পুরুষও নির্মিত হয়। ক্ষমতাবানরাই নির্মাণ করে। ...নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার মোক্ষম জায়গা হল তার যৌনতা। যা পুরুষের চেয়ে বহুগুণে বেশী। এবং তার সন্তান উৎপাদন করার মতো শারীরিক গঠন, যা পুরুষের একেবারেই নেই। এই জায়গাটা থেকেই পিতৃতন্ত্র ভয় পেতে শুরু করেছে নারীকে, তাকে বানিয়ে তুলেছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। যেখানে পুরুষের চাওয়াটাই প্রধান। তার ছাপ মারা না থাকলে বিষয়টি অবৈধ''[২৬]।

'বকুলকথা' উপন্যাসেও অনুরূপ ভাবে নারীসত্তার আখ্যান নির্মাণে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' কয়েকজন নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে 'বকুল' 'পারুল' 'শম্পা', 'নমিতা', 'রেখা' প্রমুখদের নাম বলা যেতে পারে। তবে 'বকুল' এই উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী সত্তার প্রতিনিধি। সে তার মাতা ও মাতামহীর উপলব্ধির প্রতিটি স্তরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাকে আত্মস্থ করে সুস্নিগ্ধ প্রশান্তিতে নিজেকে মেলে ধরেছে জীবনের পাতায়। সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্তরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে তার পূর্বসূরিদের দেখানো পথ অনুসরণ করেনি। ধীর স্থিরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্যশক্তি দিয়ে সত্যের অটল অবিচল অবস্থায় নিজেকে দৃঢ় রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবার জন্য কোনদিন কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করেনি। সে সর্বদা বাস্তব জগৎকে নিরীক্ষণ করেছে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। আর তাই হয়তো 'অনামিকা দেবী' নামে তার সংবেদনশীল অথচ আত্মস্থ শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে। নতুন মোড়কে নতুন যুগের উপলব্ধিকে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় তার সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। তার লেখায় মেয়েদের স্বাধীনতা বিষয়ক নানা অভিমত ও বাস্তব জগতের তথাকথিত আধুনিকতার চেহারা ধরা পড়েছে। তার মাতামহী 'সত্যবতীর' বাসনা ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হোক। তার মা 'সুবর্ণলতা'ও একইভাবে নারী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিল। আর 'বকুল' সেই স্বপ্নগুলিকেই যেন 'অনামিকা দেবী' ছদ্মনামে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার 'মা'ও নিঃসঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলিকে ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ বেদনার ইতিহাস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'বকুলের' পূর্বসূরিদের সমস্তরকম স্বপ্নের অপূর্ণতা যেন পূর্ণ হয়েছে নবজন্ম রূপে 'অনামিকা দেবী'র কলমে।

অবশ্য ‘অনামিকা দেবীর’ কথা ভালো করে জানতে হলে একটু ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখতে হয়। দেখে নিতে হয় ‘বকুলের’ ছোটবেলা আর তার মায়ের জীবনের শেষ পর্যায়। এই প্রসঙ্গে ‘অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়’ লিখেছেন–

‘‘একটু পিছন ফিরে দেখি বকুলের মা সুবর্ণলতার জীবন। চৌত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সে কী পেয়েছিল? শাশুড়ির হাতে পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, স্বামীর হাতে প্রহার ও ধর্ষণ (অনিচ্ছায় স্বামীর ইচ্ছা মেটাতে প্রায় প্রতিরাতে দেহদান), আর আটটি ছেলেমেয়ের জন্মদান। সুবর্ণলতা গোপনে লেখালেখি করত, লিখেছিল সুবর্ণলতার আত্মকথা। দূর-সম্পর্কের বট্‌ঠাকুর ছাপাখানার মালিক জগন্নাথবাবুর আগ্রহে শস্তা কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা শ্রীহীন বাঁধানো বই তার আত্মকথা। জগন্নাথবাবুর বাড়ি বয়ে দিয়ে যাওয়া সেই বইয়ের বাণ্ডিলের জন্য শ্বশুরবাড়িতে তীব্র উপহাস। তারই প্রতিবাদে ছাদে গিয়ে দুপুর-রোদে সেই বইগুলি সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। এটাই সুবর্ণলতার প্রতিবাদ। বস্তুত সারাজীবনই সে প্রতিবাদ জানিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। দর্জিপাড়ার এই বাড়ি তার কাছে হয়ে উঠেছিল কারাগার। সেই কারাগার থেকে মুক্তির জন্য সুবর্ণলতা শেষ শয্যা পেতেছিল দক্ষিণের বারান্দার চিক্-ফেলা অংশে। সে বারবার এই বাড়ির অনেক বন্ধনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। শেষের দিকে প্রতিবাদ মেয়ে বকুলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা। যে বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ, সে বাড়ি থেকেই মেয়ে পারুল ও বকুলকে স্কুলে পাঠিয়েছে, গৃহশিক্ষক রেখে তাদের শিক্ষার পথ সুগম করতে চেয়েছে’’[২৭]।

‘বকুল’ বড় হয়ে কেমন হবে তার বেশীর ভাগ শিক্ষাটা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। যেসময় মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল, সেইসময় তার মা বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষিত হওয়ার জন্য ‘বকুল’ হয়তো পরবর্তীকালে একজন যথার্থ সাহিত্যিক হতে পেরেছেন।

ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবীর' ত্রয়ী অগ্নিকন্যার মধ্যে একমাত্র 'বকুল' নারী শক্তি প্রকাশের আধার রূপে প্রতিচিত্রিত হয়েছে বলে মনে হয়।

'বকুলের' কথা শেষ হলে 'বকুলকথা' উপন্যাসে 'শম্পা'র কাহিনী শুরু হয়। আধুনিক জন-জীবনের শিক্ষায় পূর্বজদের সমস্তরকম ঘেরাটোপকে অস্বীকার করে নিজের পছন্দের ছেলে 'সত্যবানের' সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা করে। ঘটনার দ্রুতগতিময়তায় পুরাণের 'সত্যবানের' মতো করে তার স্বামীরও দুর্ঘটনায় দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা পড়ে। আর তারপর বাঁচার অদম্য চেষ্টা, জীবনের সঙ্গে 'শম্পা'র লড়াই চলতে থাকে। তার চারপাশের রঙিন পৃথিবী যেন এক পলকেই অজানা কোন ঝড়ের দাপটে বর্ণহীন হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে অনেকেই হয়তো 'শম্পাকে' অবক্ষয়ী আধুনিকতার রোল মডেল ধরে নিতে পারেন। এমনকি তাকে সাময়িকভাবে চরিত্রহীন ও বেলেল্লাপনার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন। আর তার এই সমস্ত কিছুকে প্রশ্রয় দিয়েছে পিসি 'বকুল' ওরফে 'অনামিকা দেবী'। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই 'শম্পা'কে আমরা দেখতে পাই, ঔপন্যাসিক লিখেছেন– ''শম্পার জীবনে এখন একটি নতুন প্রেমের ঘটনা চলছে। এখন শম্পা সব সময় আহ্লাদে ভাসছে। অনামিকা দেবী সঠিক খবর জানেন না, সত্যি কিছু আর সব খবর রাখেনও না, তবু যতটুকু ধারণা তাতে হিসেব করেন, শম্পার এ ব্যাপারে এই নিয়ে সাড়ে পাঁচবার হল। সাড়ে অর্থ এটা এখনও চলছে, তার মানে অর্ধপথে। প্রথম প্রেমে পড়েছিল শম্পা ওর দূর সম্পর্কের মামাতো দাদা বুবুলের সঙ্গে। শম্পার তখন এগার বছর বয়েস, বুবুলের বছর সতেরো''[২৮]। এইপর্যন্ত শুনে দেখে সকলেই উপরিউক্ত মন্তব্যগুলিকেই সমর্থন করবেন 'শম্পার' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে। কিন্তু আদতে সে তার সব পছন্দের ছেলের সঙ্গে প্রেম করেনি, তার মত অনুসারে বলে যায়, 'কেউ আমার জন্য হাঁ করে বসে

থাকবে না, আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো লাগে না...কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না'। এই মানসিকতার জন্য হয়তো তাকে কিছুটা অন্যভাবে দেখতে হয়। আসলে 'বকুলকথা' উপন্যাসের একমাত্র 'শম্পা' চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক সমকালীন 'বিয়ে' নামক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির খাঁচা ভেঙে দিতে পেরেছেন। যেভাবে 'শাস্ত্রে' বলে এতদিন ধরে পুরুষ নারীকে নরকের দার বলেছে, দাসী ও ঊনমানব বানিয়েছে, সেই 'শাস্ত্রের' ধ্বজ্জাধারী উত্তরপুরুষেরা পাণিগ্রহণের নামে যদি ভোগ্য-পণ্য নারীর সঙ্গে ধন প্রাপ্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে তখন তা 'বিবাহের' স্বীকৃতি পায়। এই ধারণা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ঔপন্যাসিক 'শম্পা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'বিবাহ' নামক প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন। আসলে ঔপন্যাসিক 'শম্পা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে আধুনিকতার মর্জিকে সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন– ''আধুনিক' শব্দটার বিশেষ একটা অর্থ আছে, ওটা বয়েস দিয়ে মাপা যায় না। একজন অশীতিপর বৃদ্ধও আধুনিক হতে পারেন, একজন কুড়ি বছরের যুবকও প্রাচীন হতে পারে। ওটা মনোভঙ্গী। কেবলমাত্র বয়সের টিকিটখানা হাতে নিয়ে যারা নিজেদের 'আধুনিক' ভেবে গরবে গৌরবে স্ফীত হয়, তারা জানে না ও টিকিটটা প্রতি মুহূর্তে বাসি হয়ে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি বছরটা পঁচিশ বছরের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসবে। আমি একজনকে জানি, আজ যাঁর বয়েস আশীর কম নয়, তবু তাঁকেই আমি আমার জানা জগতের সকলের চেয়ে বেশি আধুনিক মনে করি''[২৯]। 'শম্পা' চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' সময় দিয়ে নয় মন মর্জী দিয়ে আধুনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

'আশাপূর্ণা দেবী' অত্যন্ত সচেতন ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর সমকালীন সমাজবিবর্তনের ধারা। পুরুষতন্ত্র যেখানে নারীকে তার

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ধরে নেয়, সেখানে তিনি প্রকৃত মানুষ হিসেবে নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নিজেদের জীবনের যে স্বাধীনতার জন্য নারীরা উনিশ-বিশ শতকে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে, তারই বিবরণ যেন ঔপন্যাসিক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে। আমরা যেভাবে তাঁর রচিত 'ত্রয়ী উপন্যাসের' নায়িকাদের দেখতে পাই। তেমনি দেখছি অন্যান্য উপন্যাসের নারী চরিত্রকে। আসলে সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন আদর্শ সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, অন্যদিকে সমকালীন সমাজের সমস্তরকম ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'দ্বিতীয় বসন্ত' উপন্যাসে দেখা যায় 'বিভাস' ও 'লতিকা' সুখী-দম্পতি। একমাত্র মেয়ে 'রিম্ঝু'কে নিয়ে তাদের সুখের সংসার। উপন্যাসের মাঝেই জানা যায় 'বিভাস' ও 'লতিকার' প্রাকবিবাহের একটা সুন্দর প্রেমের কাহিনী। বাল্যকাল থেকেই তারা একে-অপরকে ভালোবাসতো। বহুরকম প্রতিকূল পরিবেশেও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট থেকেছে। কিন্তু আমরা দেখি নির্ভেজাল দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও মাঝে মাঝে আলোড়ন ওঠে। অবশ্য দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় থাকলে তা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। 'লতিকার' বিবাহিত জীবনে হঠাৎ একজন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যে তার স্বামীর সিংহাসনকে টলমল করে দেয়। কিন্তু স্বামীর প্রতি একান্ত ভালোবাসার কারণে তার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেনি । 'চশমা পাল্টে যায়' উপন্যাসে স্ত্রী 'সুকুমারীর' প্রতি 'সোমপ্রকাশের' আশ্চর্য দরদভরা অনুভূতিশীল মনের প্রকাশ দেখা যায়। 'সোমপ্রকাশ' নিজের সহজ সরল পত্নীকে একটু স্নেহ মিশ্রিত চোখেই দেখতো। কিন্তু সেই স্নেহের সঙ্গে কতটা ভালোবাসা ছিল সেটা 'সুকুমারীর' মৃত্যুর পর সে নতুন করে উপলব্ধি করে। এবং সেই ভালোবাসার প্রকাশস্বরূপই স্ত্রীর ছোটো-খাটো ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সে তার সাধ্যমত পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। ঔপন্যাসিক এরকম বহু উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারী ও নারীসত্তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছেন। যারা যুগোপযোগী হওয়ার পরেও কাল থেকে কালোত্তীর্ণ হয়ে আজকের যুগেও সমানভাবে সমাদর পেয়ে থাকে।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

১) আশাপূর্ণার কলমে পুরুষ: নারীর ত্রিপার্বিক অভিযাত্রায়, ড. ছন্দা রায়, আশাপূর্ণা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা-আশাপূর্ণা দেবী মেমোরিয়াল কমিটি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫.

২) 'গৃহধর্ম', শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক-প্রসূন বসু- নবপত্র প্রকাশন, প্রকাশকাল–১৫ই এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০.

৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩.

৪) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩.

৫) 'প্রেম ও প্রয়োজন, আশাপূর্ণা দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী,(তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৭.

৬) আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০২.

৭) মেয়েদের লেখালেখি, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪

৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮.

৯) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮.

১০) আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০৫.

১১) 'মিত্তির বাড়ি', 'আশাপূর্ণা দেবী', আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৩.

১২) 'মিত্তির বাড়ি', 'আশাপূর্ণা দেবী', আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৪.

১৩) ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০৪.

১৪) চিত্রা দেব’কে দেওয়া আশাপূর্ণা দেবীর সাক্ষাৎকার, পূনঃমুদ্রিত-যা হয় তাই আমি লিখি, কবিতীর্থ/অষ্টবিংশতি বর্ষ- গ্রীষ্ম সংখ্যা-১৪১৬, সম্পাদক-উৎপল ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১.

১৫) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৭.

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৮.

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮৩.

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৩.

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২৮.

২০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৪২.

২১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৪৭৫.

২২) ‘বকুলকথা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১২৮.

২৩)‘আর এক আশাপূর্ণা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – মাঘ ১৪০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৫-১৬.

২৪) ‘সুবর্ণলতা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮৩.

২৫)‘সুবর্ণলতা : নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প’, তপোধীর ভট্টাচার্য, আশাপূর্না নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৯৭.

২৬) মিথ্যা গোপনীয়তা নৈঃশব্দ অবলা সন্দর্ভ, মাধবী মাইতি, প্যাপিরাস, ২ গগেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-০৪, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি২০১২. ভূমিকা(রিভিউ অংশ)

২৭) ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১০০-১০১.

২৮) ‘বকুলকথা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা- অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩২৮.

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৪.

<<<<<>>>>>